(চতুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত-সার।)

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্ম্মা

কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত।

প্রকাশক—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা)।

জ্ঞান-বেদ।

বিষয়-সূচী।

[এই জ্ঞানবেদে যে সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।]

(Printed and published by Dhirendranath Lahiri at the 'Prithibir Itihasa' Printing Works, at 65, Kaliprosad Baneiji Lane, Howrah).

সূচনা।

— ০ —

অশান্তির কারণ।

শান্তিনিলয় অনন্ত-জ্ঞানভাণ্ডার বেদ—সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণায় অধিগত হয় না। কালবশে কর্ম্ম-বৈগুণ্যে মানুষ সে সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। অধ্যবসায় নাই; অনুসন্ধিৎসা নাই; শক্তির অপচয় ঘটিয়াছে; সুতরাং মানুষ সে জ্ঞান-বারিধিতে অবগাহন করিতে সমর্থ হইবে কিরূপে? পুরোভাগে বিশাল বিস্তৃত অনন্ত সমুদ্র জানিয়া, দুরধিগম্য-বোধে দূর হইতেই যে জন প্রত্যাবৃত্ত হয়; সমুদ্র-বিষয়ে সে অজ্ঞই রহিয়া যায়! বেদ কি এবং কি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই যাহারা হতাশে ফিরিয়া আসে, তাহাদেরও সেই অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অনন্ত-শান্তিনিলয় বেদ বিদ্যমান থাকিতেও ইহ-সংসারে মানুষের অশান্তির অবধি নাই।

* * *

দৃষ্টি-বিভ্রম।

সংসারের অশান্তি নিবারণের জন্য, শান্তিময় বেদ-জ্ঞান প্রতিষ্ঠা-কল্পে, লোকহিতব্রত ঋষি-মহর্ষিগণ কত-প্রকারে যে বেদজ্ঞান-প্রচার-পক্ষে প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ—সেই বেদজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্যই সংসারে প্রবর্ত্তিত হয়। অবতার-রূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভগবান্ কতবারই কতরূপে বেদজ্ঞান সংসারে প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন! মোহমুগ্ধ জীব, মোহবশে সে সকলই বিস্মৃতির অন্তরালে অন্তরিত করিয়াছে! পরন্তু জ্ঞানের আলোক অজ্ঞানের আঁধারে আবৃত হইয়াছে;—সত্যের জ্যোতিঃ অসত্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে! মানুষ এক দেখিতে আর এক দেখিতেছে;—এক বুঝিতে আর এক বুঝিতেছে! পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন সকল সামগ্রীতেই পাণ্ডুবর্ণ দেখিতে পায়, প্রকৃত দৃষ্টি-শক্তি হারাইয়া জনসাধারণও এখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

* * *

বেদ কি?

এ অবস্থায় মানুষের প্রথমেই বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত—বেদ কি? আমাদিগের প্রকাশিত ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব—চারি বেদের মধ্যেই এ তত্ত্ব উদ্ঘাটন-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। 'বেদ' শব্দে 'জানা' অর্থ সংসূচিত হয়। যদ্দ্বারা 'জানা' যায়, তাহাই বেদ। বেদ সত্য-মিথ্যার স্বরূপ-তত্ত্ব জানাইয়া দেয়; বেদ স্বর্গ-নরকের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; বেদ ধর্ম্ম জানায়; বেদ অধর্ম্ম জানায়। ফলতঃ, যাহার দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ যাহার দ্বারা স্বরূপ জানিতে পারা যায়, এক কথায় যাহার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই বেদ। সেই সর্ব্ববিধ জ্ঞানেরই নামান্তর—সত্য-বিষয়ক জ্ঞান, পরমেশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান। অতএব, যদ্দ্বারা সত্য-তত্ত্ব অধিগত হয়, পরমেশ্বর-সম্বন্ধে স্বরূপ-জ্ঞান জন্মে, পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় এবং তাঁহাতে সম্মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা আসে ও তদ্বিষয়ক উপায়-পরম্পরা অবগত হওয়া যায়, তাহাই বেদ। বেদই আত্মায় আত্মসম্মিলনের একমাত্র উপায়।

* * *

জ্ঞানবেদ—
সম্মিলনে সহায়।

বেদে যাহা বিশাল বিস্তৃত ভাবে দৃশ্যমান রহিয়াছে, 'জ্ঞানবেদে' তাহারই আভাস প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে। মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক নদ-নদীর সন্ধানে আকুল হইয়া ছুটিয়াছে; সে যদি পথিমধ্যে তড়াগ-পুষ্করিণীর সলিল-রাশি প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা সে তাহার জীবন-রক্ষার প্রয়াস পাইয়া থাকে। চির-অশান্তিময় সংসারের মধ্যে পড়িয়া, সেই শান্তির মহাসমুদ্রে চারি বেদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যে জন সমর্থ না হইবে, এই 'জ্ঞানবেদে' তাহার পিপাসা কিঞ্চিৎ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা। অপিচ, মহাসমুদ্রে মিলনের পক্ষে নদনদী স্রোতস্বতী যেমন পথ-প্রদর্শক, এই 'জ্ঞানবেদ' ও সেইরূপ জ্ঞানের অনন্ত-সমুদ্রে মিশিবার পক্ষে সহায় হইতে পারিবে।

* * *

জ্ঞানবেদ।

বেদের মধ্যে অনন্তকালের অনন্ত সম্পৎ নিহিত আছে। বাছিয়া বাছিয়া 'জ্ঞানবেদে' তাহারই কতকগুলি সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। মানুষের পরিত্রাণ-লাভের উপায় বিস্তৃতভাবে বেদে নির্দ্দেশ করা রহিয়াছে। জ্ঞানবেদে তাহারই কয়েকটী পথ লক্ষ্য করিতে পারিবেন। বেদে অনন্তকালের অনন্ত সমাজের অনন্ত ইতিহাস বীজরূপে বিদ্যমান আছে। 'জ্ঞানবেদে' তাহারই কতক-গুলির আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। জগতে যত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিল, বিদ্যমান আছে এবং অভ্যুত্থিত হইবে; বেদে তাহাদিগের সকলেরই আদি নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞানবেদে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এমন কিছু নূতন ছিল না অথবা এমন কিছু নূতন নাই এবং এমন কিছু নূতন হইবে না, বেদে যাহার প্রমাণ নাই। 'জ্ঞান-বেদ' অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তাহাই দেখাইয়া দিবে। সে হিসাবে, এই 'জ্ঞানবেদকে' চতুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্তসার বলা যাইতে পারে।

* * *

স্বরূপগত-পার্থক্য।

আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি—বেদ দর্পণ-স্বরূপ। উপমায় বস্তুর স্বরূপ-তত্ত্ব সম্যক বোধগম্য করান যায় না। 'চন্দ্র থালার মত' বলিলে অথবা 'পৃথিবী কমলা লেবুর মত' বলিলে, তাহার একদেশ-বিষয়ে সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতা আসে।

তদ্দ্বারা মূল বস্তুর সম্যক অভিজ্ঞতা-লাভ সম্ভবপর নহে। সেইরূপ, বেদকে দর্পণ-স্বরূপ বলিলে বেদের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ হয় না; উহাতে কেবল বেদের এক-দেশের এক-ভাবের দ্যোতনা করা যায় মাত্র। দর্পণের সহিত বেদের তুলনা করার তাৎপর্য্য এই যে, দর্পণে যেমন মানুষের বিভিন্ন প্রকার আকৃতির বিভিন্ন প্রকার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, বেদের মধ্যেও সেইরূপ বিভিন্ন-মার্গানুসারীর বিভিন্ন রীতি-প্রকৃতি প্রকটিত হইয়া পড়ে। ইহাই বেদের বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি যে দৃষ্টিতে বেদের প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিবেন; সেই স্তরের সেই সামগ্রীই তিনি বেদের মধ্যে ওতঃপ্রোতঃ দেখিতে পাইবেন। তজ্জন্যই বিভিন্ন-প্রকৃতির পণ্ডিতগণ বেদের মধ্যে বিভিন্ন বিপরীত ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

বেদ—অদ্বিতীয়।

এ প্রসঙ্গে কেহ হয় তো কূট প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন,—বেদের মধ্যে তবে কি কোনও সত্যবস্তু নাই? অপরিবর্ত্তিত সত্যবস্তু যেখানে আছে, সেখানে এত ভাবান্তর ঘটে কেন? এ পক্ষে উত্তর এই যে,—বস্তু সেই একই আছে, দৃষ্টি-বিভ্রমই যত কিছু ভাবান্তর ঘটাইয়া থাকে। ত্রিশির কাচ-ফলকে বর্ণ-বিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়; কৃকলাশের বর্ণ-ব্যত্যয় অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; কিন্তু মূলতঃ তাহারা সেই একই বস্তু আছে। সেইরূপ বেদের মধ্যে এক পরমার্থ-তত্ত্বই ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু দৃষ্টি-শক্তির তারতম্যানুসারে তাহাতে নানা বিষয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে। 'জ্ঞানবেদে' এ তত্ত্ব বুঝাইবার পক্ষে আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। চতুর্ব্বেদের অন্তর্গত যে কোনও একটী মন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা' প্রসঙ্গে আমরা পুনঃপুনঃ এ বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে বুঝা যায়,—কি ভাবের কি মন্ত্র কি ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে! একই মন্ত্র বিধর্ম্মীর দৃষ্টিতে এক অর্থ দ্যোতনা করে; গৃহী তাহাতে অন্য ভাব প্রাপ্ত হয়; সাধক তাহার মধ্যে পরমার্থ-তত্ত্ব লক্ষ্য করেন। ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিকের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের প্রবোধের জন্য, এমন অমানুষিক সামগ্রী জগতের মধ্যে বুঝি আর দ্বিতীয় নাই। বেদ তাই অদ্বিতীয়।

পুনরাবর্ত্তন।

যাহা অদ্বিতীয়, তাহাতে কেন ভিন্ন-ভাব আসে? একের মধ্যে বহুত্বের পরিকল্পনা—ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? পরস্পর বিভিন্ন বিপরীত ভাবের পরিকল্পনাই বা বেদ-সম্বন্ধে কেন দেখিতে পাই? এ সম্বন্ধে একটী চিন্তার বিষয় আছে। জগৎ-সৃষ্টির বৈচিত্র্য অনুস্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, এ সংসারে নূতন কিছুই হয় নাই, নাই এবং হইবেও না। যাহা ছিল বা আছে বা হইবে, তাহাই পুনঃপুনঃ কালচক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এক শ্রেণীর দার্শনিক সম্প্রদায়েরও তাই মত এই যে,—যাহা ছিল, তাহাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বৃক্ষ ছিল; লোপ পাইল; বীজ রহিল; আবার বৃক্ষ উৎপন্ন হইল! পিতা ছিলেন; স্বর্গস্থ হইলেন; পুত্র আসিল; পিতার স্থান অধিকার করিল! এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে সংসারে যাওয়া-আসার লীলা-খেলা চলিয়াছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর কলি চারি যুগ এবং চতুর্যুগের সমষ্টিগত কল্প-কল্পান্তর—তাহারই অঙ্কে সৃষ্টিপ্রবাহ ও কর্ম্মপ্রবাহ পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। অনন্ত-কালের অনন্ত আলেখ্য—বেদে তাহারই ছায়াপাত আছে। তাই যে জন যে দৃষ্টিতে যে সামগ্রীর অনুসন্ধান করে, বেদের মধ্যে সে জন সেই সামগ্রীই দেখিতে পায়।

* * *

জ্ঞানবেদ-বিভাগ।

জ্ঞানবেদে আমরা সকল দিকের সকল প্রকার দৃষ্টিরই ইঙ্গিত-আভাস প্রদান করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তাই এই 'জ্ঞানবেদ' পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইল। আকারে কোনও ভাগ ছোট বা কোনও ভাগ বড় হইলেও নিম্নলিখিত পাঁচটী বিভাগে এই 'জ্ঞান-বেদকে' বিভক্ত করিলাম। প্রথম—'ধর্ম্মভাবোদ্দীপক পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞাপক' কতকগুলি মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রাণে প্রাণে ধর্ম্মভাবোদ্দীপনের চেষ্টা পাইয়াছি। এই অংশে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি—তিনের স্বরূপ-তত্ত্ব অধিগত হইবে। ভগবান্ কি ভাবে কোথায় বিদ্যমান আছেন, ঐ সকল মন্ত্রের আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে সে সন্ধান প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়—'বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা'। কি অনুপম উচ্চ-ভাবোদ্দীপক মন্ত্র-সকল অপব্যাখ্যার পেষণ-যন্ত্রে পড়িয়া কি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, এই অংশে তাহা বোধগম্য হইবে। তদ্দারা সত্য-তত্ত্ব অধি-

গত হইতে পারিবে। তৃতীয়—'জাপ্য বেদমন্ত্রসমূহ।' যে সকল বেদ-মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক জপ করিলে নানাবিধ শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই অংশে সেই প্রকার কতকগুলি মন্ত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অংশ গৃহী মাত্রেরই নিত্য-প্রয়োজনীয় বলা যাইতে পারে। চতুর্থ—'আধি-ব্যাধি-নাশের উপায়-পরম্পরা।' অধিকাংশ বেদমন্ত্রই আধিব্যাধি-নাশমূলক। তাহারই কতক-গুলি মন্ত্র এই অংশে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। পঞ্চম—'প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা।' প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণায় যাঁহারা প্রাচীনকালের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক প্রভৃতি তত্ত্বের অনুসন্ধানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে চাহেন; এই অংশে তাঁহারা তৎপক্ষে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন।

* * *

সর্ব্বসাধারণের উপযোগী।

এই জ্ঞানবেদ যাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থের উপযোগী হয়, তৎপক্ষে আমরা বিশেষভাবে চেষ্টা পাইয়াছি। এই জ্ঞানবেদ পাঠে যদি কাহারও ইহলৌকিক ও পার-লৌকিক মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী (শর্ম্মা)।

'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়, হাওড়া।
৯ই পৌষ, ১৩৩৭ সাল।
বড় দিন।
(২৫।১২।৩০)

জ্ঞান-বেদ।

—৺ * ৺—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততম্॥

* . *

'হে ভগবন্! আমায় সেই দিব্যদৃষ্টি দেও, আমি যেন তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে তোমার পরমপদ প্রত্যক্ষ করেন। আকাশে দৃষ্টি-প্রতিরোধক বাধার অভাব-বশতঃ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন চারিদিক দেখিতে পান; জ্ঞানিগণ সেইরূপ, সদাকাল সর্ব্বত্র তোমার যে মহিমা ব্যাপ্ত আছে—তাহা অবিরোধে দেখিতে পান।' প্রার্থনার ভাব এই যে,—'মূঢ় অজ্ঞ আমি, হে ভগবন্! আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেও;—আমার সম্মুখের বাধা অপসারিত হউক,—আকাশের ন্যায় নির্ম্মল পথে আমি যেন তোমায় সদাকাল সর্ব্বত্র দেখিতে পাই।'

* . *

যজ্ঞ-সমূহের, তপস্যাদি কার্য্যের এবং সকল শুভকর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য বেদপাঠে অবগত হওয়া যায়। এই জন্যই বেদ পরম নিঃশ্রেয়স্-কর বলিয়া উক্ত হয়। যাঁহারা বেদ অধ্যয়নে বিরত আছেন, শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাঁহারা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হস্তী অথবা চর্ম্মময় প্রাণহীন দেহধারী মাত্র। শাস্ত্র-বাক্যের মর্ম্ম এই যে, মানুষ, যদি তুমি সাংসারিক আধিব্যাধিশোকতাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, যদি তোমার পরম-নিঃশ্রেয়স্-রূপ মুক্তি লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা থাকে, তুমি বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হও। যদি বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্তি না জন্মে, তুমি বৃথাই দেহধারণ করিয়া আছ, বুঝিবে। কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাণহীন হস্তী যেমন অথবা চর্ম্মাচ্ছাদিত প্রাণশূন্য মৃগমূর্ত্তি যেমন—হস্তীর অথবা মৃগের উপযুক্ত কোনই কার্য্যসাধক নহে; মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, দ্বিজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া, যদি বেদ অধ্যয়ন না করিলে তোমারও দেহধারণ সেইরূপ বৃথাই হইবে।

• • •

সকল বেদ অধ্যয়ন, সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইতে পারে। কিন্তু যিনি যে শাখার অন্তর্ভুক্ত, সে শাখার সে বেদ অধ্যয়ন করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। বিদ্যানুরাগী অনেকেই আছেন; বিদ্যার চর্চ্চা অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান দেখিতে পাই; গ্রন্থাদি পাঠে অনেকে অকুণ্ঠিত-চিত্তে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনার ইষ্টসাধক—ঐহিক-পারত্রিকের মঙ্গলপ্রদ যে বেদ, তৎপ্রতি অতি অল্প জনেরই দৃষ্টি নিপতিত দেখি। ইহা যে আত্মার পরম অনিষ্টকর, তাহা প্রায়ই কেহ স্মরণ করেন না। শাস্ত্র তারস্বরে কহিয়াছেন—"যস্ত্বনধীতবেদোঽন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাৎ অসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি।" অর্থাৎ, বেদ অধ্যয়নে বিরত থাকিয়া যিনি অন্য গ্রন্থাদি পাঠে সময়ক্ষেপ করেন, পুত্রাদি সহ তাঁহার নীচগতি-প্রাপ্তি ঘটে। বেদপাঠের সুফল-বিষয়ে শাস্ত্র-বাক্যের অন্ত নাই। সর্প যেমন খোলস পরিত্যাগ করিয়া নবদেহ লাভ করে, বেদাধ্যয়নের ফলে মানুষও সেইরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে শস্ত্রোক্তি আছে; যথা,—

"সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচেবাহির্ব্বিমুচ্যতে॥"

• • •

অনেকের বিশ্বাস, বুঝি বা তোতাপাখীর ন্যায় আবৃত্তি করিলেই বেদ-পাঠের ফললাভ হয়। তাই অনেকত্র দেখি. মন্ত্রটি মাত্র কণ্ঠস্থ আছে, কিন্তু অর্থজ্ঞান নাই। কেহ কেহ আবার, বুঝিয়াই হউক বা না বুঝিযাই হউক, বেদ-মন্ত্রের অর্থকে বাগ্‌জালে আবৃত করিয়া রাখিতে চাহেন। প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হইলে, পরন্তু কদর্থ-বিভ্রমে নিপতিত থাকিয়া আত্ম-প্রাধান্য-খ্যাপনে প্রয়াসী হইলে, শোচনীয় অবস্থাতেই উপনীত হইতে হয়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অনেকেই এখন এই অবস্থায় উপনীত। বেদ কি—তাঁহারা অনেকে হয় ত চক্ষেও দেখেন নাই। অথবা, বেদের কোনও একটা প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখিয়া, তাঁহাদিগকে লজ্জাবিনম্র হইতে হইয়াছে; এইজন্য, বেদার্থ প্রচ্ছন্ন রাখিবার আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের মধ্যে অতিমাত্রায় বলবতী দেখিতে পাই। কিন্তু যাঁহারা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পারিবেন,—বেদের মধ্যে কি অমূল্য রত্নরাজি ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিয়া আছে; তাঁহারা অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারিবেন;—তাঁহাদের নিকট সত্যের আলোক প্রকাশের ন্যায়, বেদ-বাক্যের অর্থ প্রকাশ-পক্ষে কোনও সংশয় উপস্থিত হইবে না। বেদাধ্যয়নে অর্থবোধ একান্ত-প্রয়োজন। বেদানুক্রমণিকার প্রারম্ভে মহামতি সায়ণাচার্য্য তাই উচ্চ-কণ্ঠে বিঘোষিত করিয়াছেন,—'যিনি বেদ-অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথচ বেদের অর্থ অবগত নহেন, তিনি স্থাণুর ন্যায় কেবলমাত্র ভারবহন করিযাই থাকেন। অগ্নিহীন-প্রদেশে শুষ্ক-কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, অর্থ না জানিযা বেদ-মন্ত্র অধ্যযনও সেইরূপ নিষ্ফল জানিবে।' এ সম্বন্ধে যাস্কোদ্ধৃত শাস্ত্রোক্তি; যথা,—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্‌মা॥
যদ্‌গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ।"

* * *

মনুষ্য-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, বেদরূপ নেত্র দ্বারাই তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যিনি বেদজ্ঞ নহেন, ব্রহ্মবস্তু তাঁহার জ্ঞানাতীত রহিয়াই গেলেন। শ্রুতি কহিয়াছেন,—"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্।" শাস্ত্র-

বাক্য যদি মান্য করিতে হয়, আপনার শ্রেয়োলাভের প্রতি যদি প্রযত্ন থাকে, সমগ্র বেদ অধ্যয়নে সমর্থ যদি নাও হইতে পার, আপন আপন শাখার অন্তর্গত বেদ পাঠে অনুরক্ত হও। স্ব-শাখোক্ত বেদও যদি সমগ্র পাঠ করিতে সমর্থ না হও, তবে যতদূর সামর্থ্য হয়, তৎপক্ষে বিরত হইও না। নিত্যকর্ম্ম-বিধিতে প্রতিদিন চতুর্ব্বেদের আদ্যমন্ত্র-চতুষ্টয় ব্রহ্মযজ্ঞরূপে পঠিত হইয়া থাকে। সেই পঠন-ক্রিয়া হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি? তাহার সার-মর্ম্ম এই যে,—'চতুর্ব্বেদ পাঠ করিতে উদ্‌বুদ্ধ হও; 'যদি সমগ্র বেদপাঠে শক্তি না থাকে, যে বেদের যতটুকু পাঠ করিতে শক্তিমান্ হও—তাহাই অধ্যয়ন কর। হেলায় রত্ন হারাইও না।' বেদ যেমন কর্ম্মপদ্ধতি-জ্ঞাপক, বেদ তেমনই জ্ঞানের পরিপোষক। একাগ্রচিত্তে মন্ত্রগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন; কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—ত্রি-তত্ত্বের সাধনায় অনুপ্রাণিত হইবেন। দেখিবেন,—অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ স্বতঃ-বিকশিত হইবে। বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবার সময় বেদের প্রথমাংশ প্রথমে হয় তো কিছু দুর্ব্বোধ জটিল বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু উত্তরোত্তর যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, ইক্ষুদণ্ডের ক্লেশকর চর্ব্বণ-ব্যাপারের পর চোষণোপযোগী মধুর রসের ন্যায় আনন্দসুধাস্বাদ ততই অনুভূত হইবে।

* * *

এই জন্যই সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রথমেই শীর্ষোদ্ধৃত আচমন মন্ত্র—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্র—উচ্চারিত হয়। উহাতে প্রার্থনা প্রকাশ পায়,—'হে ভগবন্! আমার জ্ঞান-পথের বাধা অপসারণ করিয়া দেও—আমি যেন অবাধে সত্য-দর্শনে সমর্থ হই।'

—— • ——

জ্ঞান-বেদ।

———•:*:•———

পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন্

পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্

পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।

* • *

ভক্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন ;—মন প্রাণ আত্মা চক্ষু শ্রোত্র আয়ুঃ প্রভৃতি ফিরিয়া চাহিতেছেন ! কহিতেছেন,—'হে ভগবন্ ! আমার সেই সকল ফিরিয়া আসুক।' এবম্বিধ প্রার্থনায় কি মনে হয় ? মনে হয় না কি,—'কি যেন ছিল, এখন যেন হারাইয়াছি, আর সেই হারানিধি পাইবার জন্য যেন আকুল আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছে !' যদি বলি—'আমার মন ফিরিয়া আসুক'—তাহাতে কি ভাব মনে আসে ? মনে হয় না কি,—সেই যে সরল অকপট শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত মন আমি আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া, সে আজ বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কলুষ-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইয়াছে ! তাই প্রার্থনা—সেই মন আমার আবার ফিরিয়া আসুক।

* • *

মনই মূল। ভগবানের সেবাপরায়ণ হইতে হইলে, ভগবৎকার্য্যে জীবন বিনিযুক্ত করিতে হইলে, শিশুর ন্যায় সরলতা আবশ্যক;—কুটিল মন ভগবৎ-সেবার অধিকারী নহে। পঞ্চমবর্ষীয় বালক সেই ধ্রুবের সরলতায় সিংহ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল। ভগবৎ-প্রাপ্তি-মূলক সারল্য সেইরূপই হওয়া চাই। 'হে ভগবন্! আমার মন ফিরিয়া আসুক'—এইরূপ প্রার্থনায় কি বুঝায়? বুঝিতে পারি না কি,—'আমি যেন সরল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি!'

• • •

আর প্রার্থনা হইয়াছে,—'আমার আয়ুঃ ফিরিয়া আসুক।' আমি কি মরিয়াছি? কৈ—আমি তো মরি নাই! 'জল্‌জ্যান্ত' জীবন্ত! তবে এমন প্রার্থনা কেন? আমি যেন এমন আয়ুঃ পাই,—যে আয়ুঃ আমায় সৎকর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে পারে। আহার-মৈথুন-নিদ্রা এই লইয়াই তো জীবন নহে! তেমন জীবন পশুতেও ধারণ করে! তেমন আয়ুঃ তো অতি নীচ পাষণ্ডেরও অধিকারে আছে! এখানে কি ভগবানের নিকট সেই আয়ুব প্রার্থনা হইয়াছে? কখনই নহে। বুঝিতে হইবে—সৎকর্ম্মশীল পুণ্যপূত আয়ুই এখানে কামনার সামগ্রী।

• • •

প্রার্থনায় আরও বলা হইয়াছে,—'আমার প্রাণ ফিরিয়া আসুক, আমার আত্মা ফিরিয়া আসুক।' আমাদিগের প্রাণ থাকিতেও যে প্রাণ নাই, আমাদিগের আত্মা থাকিতেও যে আমরা আত্মাশূন্য। কোথায় আমার প্রাণ? আমি অনায়াসে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই, আমি ভাই হইয়া ভাইকে প্রবঞ্চনা করি; আমার আবার প্রাণ আছে? প্রাণ ছিল বটে—সেই দিন;—শিশুকালে যেদিন পুত্তলিকার প্রতিও মমতার সঞ্চার হইত,—ক্ষুদ্র একটী কীটের বিয়োগ-ব্যথায় প্রাণ ফাটিয়া যাইত! চৈতন্য? —সে তো অনেক দিনই অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! চৈতন্য থাকিলে কি আর নিত্য-নূতন অপকর্ম্ম করিয়া, মাথার উপরে যিনি বিদ্যমান রহিয়া সকলই দর্শন করিতেছেন—তাঁহাকেও লুকাইবার চেষ্টা করিতাম? অপকর্ম্ম করি, আর মনকে প্রবোধ দিই,—'কেহ দেখিতে পাইল না।' এই কি চৈতন্যের কার্য্য? চৈতন্য ছিল বটে তখন—যখন পাপের পথে

প্রথম অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম! কিন্তু এখন পাপে এতই অভ্যস্ত যে, পাপ-কার্য্যে এখন আর হৃদয় একবারও কম্পিত হয় না! তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমার সেই চৈতন্যটুকু ফিরাইয়া দাও!'

* * *

শেষ প্রার্থনা,—'আমার চক্ষুকে আর কর্ণকে আমি যেন পুনঃপ্রাপ্ত হই।' কেন?—আমার কি চক্ষু নাই? এমন 'ড্যাবডেবে' জোড়া দুইটা চক্ষু থাকিতে, আমি আবার চক্ষু ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিতেছি কি! এইরূপ, শ্রোত্রও তো কৈ বধির নহে! নিন্দা-সুখ্যাতি কোন্ কথাই বা আমি শুনিতে না পাই! তবে আবার শ্রোত্রের প্রার্থনা কেন? চোখও দেখিতে পায়, কাণেও শুনিতে পাই; তবে আবার কি ফিরিয়া পাইবার কামনা করি? কেন এ কামনা? কেন এ প্রার্থনা?

* * *

ভ্রান্ত!—সে এ চোখ—এ কাণ নয়! এ কি আর চোখ—এ কি আর কাণ? যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-মূর্ত্তি দেখিতে না পাইল, যে শ্রোত্র ভগবানের গুণকথা শুনিতে না পাইল; পরন্তু যে চক্ষু কেবলই বিষয়-বিভবে আকৃষ্ট রহিল, যে কর্ণ কেবলই আত্ম-প্রশংসা ও পরগ্লানি শ্রবণ-রূপ বিষম বিষে পূর্ণ রহিল; সে চক্ষু কি আর চক্ষু?—সে কর্ণ কি আর কর্ণ-নাম বাচ্য? তাই প্রার্থনা—'হে ভগবন্। আমায় সেই চক্ষু দাও—যে চক্ষু কেবল তোমারই রূপ দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে! আমায় সেই কর্ণ দাও—যে কর্ণ কেবল তোমারই কথা-রূপ সুধা-রসে পূর্ণ থাকে। আমার মনঃ প্রাণ আত্মা ইন্দ্রিয়গণ ভগবদনুসারী হউক।'

———

জ্ঞান-বেদ।

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।

বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি॥

বলমসি বলং ময়ি ধেহি।

ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি॥

মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।

সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥

আপনি তেজঃ,—আমাতে তেজঃ নিহিত করুন; আপনি বীর্য্য,—আমাতে বীর্য্য নিহিত রাখুন; আপনি বল,—আমাতে বল-সঞ্চার করুন; আপনি ওজঃ (কান্তি),—আমাতে ওজঃ ধারণ করুন; আপনি মন্যু (ক্রোধ),—আমাতে ক্রোধ রক্ষা করুন; আপনি সহ (সহিষ্ণুতা),—আমাতে সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ণ রাখুন

আমি প্রকৃত মানুষ হইতে চাই,—আমি মানুষের শ্রেষ্ঠ দেবতা হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। তাই আমার কামনা,—যিনি স্বয়ং তেজঃ, তাঁহার তেজঃ আমার মধ্যে নিহিত হউক; তাই আমার প্রার্থনা,—যিনি স্বয়ং বীর্য্য, তাঁহার বীর্য্য আমাতে স্থাপিত হউক; তাই আমার আকিঞ্চন,—যিনি স্বয়ং বল, তাঁহার বল আমাতে সঞ্চিত হউক; তাই আমার প্রযত্ন,—যিনি ওজঃ, তাঁহার ওজঃ (কান্তি) আমাতে ধারণ করুন। এই সকলই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের —দেবত্বের উপাদান। আমি তাহাই চাই।

• • •

আমি ক্রোধও চাই, আবার সহিষ্ণুতাও চাই; অগ্নির দাহিকা-শক্তিও যেন আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে;—আবার সলিলের স্নিগ্ধতাও যেন আমার মধ্যে বিরাজ করে। আমি যখন দেখিব—দুর্ব্বলের প্রতি প্রবল অযথা পীড়ন করিতেছে,—অত্যাচারীর কশাঘাতে নিরীহ জনের আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছে; তখন যেন আমার ক্রোধ-বৃত্তি জাগিয়া উঠে,—তখন যেন আমাতে মূর্ত্তিমান্ তেজঃ বিকাশ পায়,—তখন যেন আমি, প্রবলকে পরাভূত করিয়া, দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে সমর্থ হই। এইরূপ, আবার যখন দেখিব, অনুতাপের অশ্রুজলে পাপীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে, অনুশোচনার অন্তর্দ্দাহে দগ্ধীভূত হইয়া আততায়ী চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে;—তখন যেন আমার সহিষ্ণুতা তাহাকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা দেয়,—তখন যেন আর দুর্ব্বল দেখিয়া তাহার পীড়নে আমার স্পৃহা না জন্মে। চাই আমি—ক্রোধ-সহিষ্ণুতার এই সাম্য-ভাব। তাই আমি প্রার্থনায় জানাইতেছি,—

"মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥"

• • •

তাহাই দেবত্ব—তাহাই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব। দেহের মধ্যে—অন্তরের মধ্যে —সকল বৃত্তিরই স্ফূর্ত্তি চাই। অথচ, সকল বৃত্তিই সংযত থাকা আবশ্যক। দুর্ব্বল হইলেও চলিবে না—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আবার বলের অপব্যবহার করিলেও বাঁচিবে না,—"অপ্রযুক্তং বলং মরণং নাস্তি সংশয়ং॥" যিনি তেজঃ, তাঁহার নিকট হইতে তাই তেজঃ সংগ্রহ করিতে হইবে; যিনি বীর্য্য, তাঁহার নিকট হইতে তাই বীর্য্যের অধিকারী হইতে হইবে; যাঁহাতে

বল,—যাঁহাতে ওজঃ, তাঁহার নিকট হইতে সেই বল—সেই ওজঃ গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনাতে ধারণ করিতে হইবে। ইহাই প্রধান শিক্ষা—ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। এখন, কিসে আমরা এই সকলের অধিকারী হইতে পারি,—তাহাই প্রধান চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। ভগবানের বা দেবতার উপাসনা—সে আর অন্য কিছু নয়! ভগবান্ বা দেবতা কি, তাহা বুঝিয়া, তাঁহার অনুসরণ করাই উপাসনা। সেই উপাসনার প্রভাবেই দেবত্ব অধিগত হয়। শীর্ষোদ্ধৃত বেদ-মন্ত্র এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে:—

দেবতা—নূতন কিছু নহে ;
দেবত্ব—সংসার-মাঝে রহে।
মনুষ্যই দেবতা হইতে পারে ;—
দেবতার গুণধর্ম্ম অধিকারে।

* * *

এ পক্ষে প্রথমেই বুঝা আবশ্যক, দেবতাই বা কি—আর দেবত্বই বা কাহাকে কহে! কতকগুলি বিশিষ্ট গুণধর্ম্মই দেবত্ব, আর তৎসমুদায়ের অধিকারীই দেবতা। যখন বলিব,—দেবতা সত্যস্বরূপ ; তখনই বুঝিতে হইবে—যাহা সত্য, তাহাই দেবত্ব,—যিনি সত্যের অধিকারী, তিনিই দেবতা। এইরূপ, যখন বুঝিব—দেবতা দয়াময়, তখনই বুঝিতে হইবে,—যাহা দয়ার কার্য্য, তাহাই দেবত্ব,—আর, যিনি তাহার অধিকারী, তিনিই দেবতা। এইরূপ,—'তেজঃ বল', 'বীর্য্য বল', 'বল বল', 'ওজঃ বল', 'মন্যু বল', 'সহ বল', যে যে শক্তির যেমন ভাবে প্রয়োজন, যাঁহাতে তাহার যথাযথ সমাবেশ আছে, তিনিই দেবতা। মানুষ! তুমি যদি দেবতা হইবার আকাঙ্ক্ষা কর, দেবত্বের—দেবতার সেই গুণধর্ম্মের-অধিকারী হইবার পক্ষে প্রযত্নপর হও। দেবতার গুণধর্ম্মের বা দেবভাবের অনুসরণ-অনুশীলনই দেবতার উপাসনা। তদ্দ্বারাই দেবত্ব অধিগত হয়।

—— • ——

জ্ঞান-বেদ।

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্।
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং শোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্॥
বাগ্ যজ্ঞেন কল্পতাং মনো যজ্ঞেন কল্পতাম্।
আত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং ব্রহ্ম যজ্ঞেন কল্পতাম্॥
জ্যোতির্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বর্যজ্ঞেন কল্পতাম্।
পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্॥

কি প্রকারে আয়ু বৃদ্ধি পায়, কি প্রকারে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়; সদাকাল সকলেরই সেই প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। কেবল মানুষ বলিয়া নহে,—সংসারের সকল প্রাণীই আয়ুঃ বৃদ্ধির জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া ফিরিতেছে। তবে মনুষ্যেতর প্রাণিপর্য্যায় আয়ুঃ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য

হয় তো বুঝিতে না পারে; কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনুষ্য আমরা,—আমরাও কি সে উদ্দেশ্য বুঝিব না? বেদ বুঝাইতেছেন,—"আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্।" যজ্ঞের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—সত্যের জন্য—ভগবানের জন্য—তোমার আয়ুঃ যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

• •

প্রাণই বা কিসের জন্য? যে প্রাণ, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—ভগবানের জন্য নিয়োজিত হইতে না পারিল; সে প্রাণের কি প্রয়োজন? যে প্রাণ পরের জন্য না কাঁদিল; যে প্রাণ আপনার মুখের গ্রাস অকাতরে অন্যের মুখে তুলিয়া দিতে না পারিল; সে প্রাণকে কি আর প্রাণ বলে? যে দেশের শাস্ত্র প্রতি জনের নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে 'পঞ্চসূনা' (উনন, শিল-নোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকির গড়, কলসী-পিঁড়ি প্রভৃতির চাপে জীব-নাশ-জনিত পাপ) পাপ নাশের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; সে দেশের সে জাতির প্রাণ—কত বড় হওয়া প্রয়োজন, সহজেই বোধগম্য হইবে না কি? বেদ তাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—"প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্।" তোমার প্রাণ যেন, যজ্ঞের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—সত্যের জন্য—ভগবানের জন্য, নিয়োজিত হয়।

• • •

চক্ষু কি দেখিবে? তাহার দেখিবার সামগ্রী সংসারে কি আছে? সে কি চোরের ন্যায় পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইবে? অথবা, সে কি নারীর রূপ-সুধা পান করিবার জন্য মত্ত হইয়া পরস্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিবে? চক্ষুর যদি সে প্রবৃত্তি—সে প্রকৃতি হয়, সে চক্ষুকে, বিল্বমঙ্গলের মত, উৎপাটন করিয়া ফেলিতে পারিবে না কি? অপকর্ম্মের পশ্চাদ্ধাবন ভিন্ন, চক্ষুর কাজ যে অনেক আছে! সে চক্ষুকে চক্ষুই বলি না,—যে চক্ষু সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের মধ্য হইতে সত্যকে বাছিয়া লইতে না পারে; সে চক্ষুকে চক্ষুই বলি না,—যে চক্ষু এই মিথ্যার সংসারে আসিয়া সত্যের অনুসরণ করিতে সমর্থ না হয়। পরন্তু, সেই চক্ষুই সার্থক চক্ষু,—রূপ দেখিতে দেখিতে যে চক্ষু সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতে সেই জগৎপিতার রূপ দেখিয়া তন্ময় হইতে পারে। বেদ সেই শিক্ষাই দিতেছেন—"চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্।" তোমার চক্ষুকে যজ্ঞের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—সত্যের জন্য বিনিযুক্ত কর।

কেন-না, তাহাতেই সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হইবে,—সকল রূপেই রূপময়ের অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। যে চক্ষু ভগবানকে না দেখিতে পাইল, সে চক্ষু চক্ষুই নহে। পরন্তু, বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বনাথ যে মনোময় মোহন রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, যে চক্ষু তাহা প্রত্যক্ষ করিল;—প্রত্যক্ষ করিয়া, আনন্দে বিভোর হইতে পারিল; সেই চক্ষুই চক্ষু।

•.•

ঐইরূপ শ্রোত্র! শ্রোত্র (কর্ণ)! তুমি পরকুৎসা-শ্রবণে বড়ই আনন্দ পাও—নয়? যেখানেই পরচর্চ্চা, সেখানেই তুমি উৎকর্ণ হইয়া আছ! আর, মিথ্যা-শ্রবণেই কি তোমার তৃপ্তি? জগতে যত কিছু মিথ্যা আছে, সহস্রধারায় তোমার রন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে; আর তাহাতেই তুমি আনন্দ পাইতেছ। বলি, এই জন্যই কি তোমার সৃষ্টি? যদি তাই হয়, এখনই সীসক গলাইয়া কর্ণ-রন্ধ্রে ঢালিয়া দেওয়া হউক; কর্ণরন্ধ্র বন্ধ হউক। জগৎপাবন ভগবানের মহিমা-কীর্ত্তন, যে কর্ণে প্রবেশ করিল না; সে কর্ণ তো কর্ণই নহে! তাই বেদ বলিতেছেন—"শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্।" যজ্ঞের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—সত্যের জন্য—শ্রোত্র বিনিযুক্ত হউক। চক্ষু দেখুক—জগৎজোড়া তাঁর রূপ; আর কর্ণ শুনুক—জগদ্ব্যাপী তাঁর মহিমা—প্রতি পতত্রীর স্বরে প্রতি বাতহিল্লোলে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে। তবেই তো শ্রোত্রের সার্থক সমাবেশ।

•.•

বাক্! কেন মিথ্যা বলিতে তোমায় এত ব্যগ্র দেখি? আবশ্যকে অনাবশ্যকে এ সংসারে প্রায় সকল মানুষই কেন মিথ্যা বলিতে চায়! কেবল মিথ্যা বলা নহে; পরন্তু জীবের যাহাতে অনিষ্ট ঘটে, প্রতি মানুষকেই আবার তদ্রূপ বাক্য-কথনেও অভ্যস্ত দেখি। মিথ্যা বলিবে, লোকের অহিতকর কথা কহিবে,—বাগিন্দ্রিয়!—এই জন্যই কি তোমার সৃষ্টি! যদি তাই হয়, কোনও প্রয়োজন নাই,—তেমন জিহ্বা এখনই কাটিয়া ফেলা হউক। বেদ উপদেশ দিতেছেন,—"বাগ্ যজ্ঞেন কল্পতাম্।" তোমার বাক্য, যজ্ঞের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—সত্যের জন্য—ভগবানের উদ্দেশে বিনিযুক্ত হউক। যদি কথা কহিতে হয়, কও—সত্য কথা! যদি কথা কহিতে চাও, কথা কও যজ্ঞের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য।

যদি বাক্যস্ফূর্ত্তির আবশ্যক হয়, হউক—ভগবানের পতিতপাবন মাহাত্ম্য-পরিকীর্ত্তন! সত্য ভিন্ন আর কথা নাই, ভগবানের মহিমা-কীর্ত্তন ভিন্ন আর বাক্য নাই। যে বাগিন্দ্রিয় তাহাই জানিল,—সেইই বাগিন্দ্রিয়; অন্যথায়, বাগিন্দ্রিয় বাগিন্দ্রিয়ই নহে।

* * *

আত্মা বল, মন বল, ব্রহ্ম (বেদ) বল, জ্যোতিঃ (স্বয়ংপ্রকাশ-পরমাত্মা) বল, স্বঃ (স্বর্গ) বল, পৃষ্ঠ (স্তোত্র) বল—কিছুই কিছু নহে;—সকলই যদি সৎকর্ম্মসাধনে সত্যের উদ্দেশ্যে বিহিত না হয়। ফলতঃ মূল লক্ষ্য সকলেরই হওয়া চাই—যজ্ঞসাধন, সৎকর্ম্মকরণ, সত্যের অনুসরণ। যে অঙ্গ বা যে বৃত্তি সৎকর্ম্মসাধনে সত্যের অনুসরণে সমর্থ না হইল, তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন প্রয়োজন। অপিচ, যে আত্মা, যে মন, যে বেদ, যে জ্যোতিঃ বা যে স্বর্গ—সত্যের পথ প্রদর্শনে সমর্থ না হইল, সে আত্মা—আত্মাই নহে, সে মন মনই নহে। সে আত্মা চাই না, সে ব্রহ্ম চাই না, সে জ্যোতিঃ চাই না, সে স্বর্গ চাই না, সে স্তোত্রেও প্রয়োজন নাই। আত্মা যদি সত্যে ন্যস্ত হইতে না পারিল, মন যদি সত্যের অনুসন্ধানে ধাবমান না রহিল, ব্রহ্ম (বেদ) যদি সত্যের সন্ধান না জানাইল, জ্যোতিঃ বা স্বর্গ যদি সত্যের দর্শন না করাইল,—তবে সে সকলে কি প্রয়োজন? বেদ তাই সকল উপদেশের চরম উপদেশ দিতেছেন,—"যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্।" তোমার যজ্ঞও যেন আবার যজ্ঞের জন্য বিহিত হয়। আমরা যজ্ঞ করি, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, সত্যের সন্ধান লই,—সকলই এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া। কত কামনা থাকে কত—প্রার্থনা থাকে—অন্তরালে। আমরা অনেক সময় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, উচ্চপদ লাভ করিবার জন্য, অথবা সুনাম-সুযশঃ অর্জ্জনের আশায়। চাই ধন, চাই যশঃ, চাই শত্রুনাশ, চাই মনোরমা পত্নী; যজ্ঞ করি, আর প্রার্থনা জানাই,—"ধনং দেহি রূপং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" ইত্যাদি। কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। যজ্ঞ কর, সৎকর্ম্ম কর, সত্যের অনুসারী হও; কিন্তু অন্য আকাঙ্ক্ষা প্রাণে যেন স্থান না পায়। তাই বেদ বলিতেছেন—"যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্।"

———

জ্ঞান-বেদ।

শং চ মে ভয়শ্চ মে প্রিয়ং চ মেঽনুকামশ্চ মে

কামশ্চ মে সৌমনশ্চ মে

ভগশ্চ মে দ্রবিণং চ মে ভদ্রং চ মে শ্রেয়শ্চ মে

বসীয়শ্চ মে যশশ্চ মে—যজ্ঞেন কল্পতাম্।

যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—আমার জীবন উৎসর্গীকৃত হউক। আমার ঐহিক সুখ, আমার পারলৌকিক সুখ, আমার সকল প্রকার সুখ, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—পরিকল্পিত হউক। আমার প্রীতিপদ সামগ্রী, আমার অনুকূলসাধ্য পদার্থ, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—নিয়োজিত হউক। আমার বিষয়-ভোগজন্য কামনা, আমার চিত্তসুখপ্রদ সুহৃদ্‌গণ, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—বিনিযুক্ত হউক। আমার সৌভাগ্য, আমার কল্যাণ ও পারলৌকিক মঙ্গল, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—নির্দ্দিষ্ট হউক। আমার বাসস্থান, আমার যশঃকীর্ত্তি, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—অনুসৃত হউক। ফলতঃ, আমার 'আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে, সকলই যজ্ঞের জন্য—সৎকর্ম্মের জন্য—ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হউক! এই সঙ্কল্পই মানুষের প্রধান সঙ্কল্প হউক।

জ্ঞান-বেদ।

—৹৹ ❖ ৹৹—

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥

• • •

কিবা সামগানে, কিবা ঋগ্মন্ত্রোচ্চারণে, কিবা অন্য কোনরূপ স্তোত্রে, যেখানে যে নামে যে ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা করা হউক না কেন, সে সকল অর্চ্চনাই সর্ব্ব-স্বরূপ সেই একেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। বুঝা উচিত—সকল পূজাই তাঁহার পূজা।

• • •

কেহ ইন্দ্রদেবতার পূজা করেন, কেহ বায়ুদেবতার পূজা করেন, কেহ অগ্নিদেবতার পূজা করেন, কেহ বা শিবের, কেহ বা ব্রহ্মার, কেহ বা বিষ্ণুর অর্চ্চনায় ব্রতী আছেন; আবার, কেহ বা দুর্গার, কেহ বা কালীর, কেহ বা জগদ্ধাত্রীর, কেহ বা সরস্বতীর উপাসনা করিয়া থাকেন; ইঁহাদের অনেকের হৃদয়ে হয় তো ভেদ-ভাবও বিদ্যমান থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। কেন-না, ভগবান্ সর্ব্বদেবময়। যিনি যে দেবতারই পূজা-অর্চ্চনা করুন, সকল পূজা-অর্চ্চনাই তাঁহাতে গিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ, এ মন্ত্রে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, যে পথ দিয়াই হউক, অগ্রসর হও;—অগ্রসর হইতে হইতেই তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইবে।

• • •

অধুনা নূতন নূতন যুক্তির অবতারণায় নূতন নূতন পথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল যুক্তি যে সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ, তাহা কখনই মনে করিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্তের অবতারণায় বিষয়টা বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অনেকে, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, আমাদের প্রতিমা-পূজা প্রভৃতিকে নিষ্ফল হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সে তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি। কেন-না, ঐ প্রতিমা-পূজার মধ্য দিয়াই প্রতিমার যিনি লক্ষ্যস্থল, তাঁহার নিকট পৌঁছান যায়।

* * *

সমুদ্র যে কি, কখনও দেখি নাই; অথবা সমুদ্র যে কি, তাহা জানি না; কিন্তু যদি আমি জানি, এই নদীতেই সমুদ্রের রূপকণা আছে, আর এই নদীস্রোতের অনুগমন করিলেই সমুদ্রে উপনীত হওয়া যায়; তাহাতে, তদনুরূপ কর্ম্মের ফলে, সমুদ্র-দর্শন বা সমুদ্রে মিলন আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া আসে না কি? এই জন্যই বলিতে হয়,—যাঁহার যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করুন;—অগ্রসর হইতে হইতেই কেন্দ্রস্থানে উপনীত হইতে পারিবেন। এই জন্যই আরও বলি, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" গীতার অমূল্য বাণী জনে জনে স্মরণ করুন। একেবারে পর্ব্বত-লঙ্ঘন-আশা দুরাশা মাত্র। অগ্রসর হউন—ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন। অগ্রসর হইলেই অভীষ্ট সামগ্রী পাইবেন।

* * *

এ মন্ত্র বুঝাইয়া দিতেছেন,—'সংশয়ান্বিত হইও না; যেরূপে যে প্রণালীতে হউক, ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও; তোমার সকল অর্চ্চনাই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। ফলতঃ, যে মার্গানুসারীই হও, তুমি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা কর।'

জ্ঞান-বেদ।

—∴ * ∴—

উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগাদপ

প্রাগাত্তম আজ্যোতিরেতি।

আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্য্যায়াগন্ম

যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ॥

• • •

উষার আলোকে সংসার যেমন জাগ্রৎ হয়, প্রকৃতির মনোহারিণী মূর্ত্তি যেমন দেখিতে পায়, আপন আপন দৈনন্দিন কর্ম্মে যেমন প্রবৃত্ত হইতে পারে; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরাও সেইরূপ হৃদয়ের মধ্যে উষার আলোক লক্ষ্য কর;—ঐ দেখ, জ্ঞানোন্মেষিণী উষা তোমাদিগকে জাগ্রৎ করিবার জন্য নবীন আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণ করিতেছেন;—ঐ দেখ, তিনি তোমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন,—'জীবাত্মা চৈতন্য লাভ করিয়াছেন, অজ্ঞান-অন্ধকার অপসৃত হইয়াছে, পরম জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়াছে, জ্ঞান-সূর্য্যের প্রকাশ পথ উন্মুক্ত উদ্ঘাটিত হইয়াছে।' আরও, ঐ দেখ, তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন,—'উঠ, এস, নিতান্ত

গন্তব্য সেই পথে সেই দেশে গমন কর,—সমাধিলব্ধ যে পথে যে দেশে যাইতে পারিলে জীবন-ধারণ-রূপ আয়ুষ্কাল বৰ্দ্ধিত হইবে,—আর ক্ষীণ হইতে হইবে না; মুক্তি পাইবে, অমরত্ব লাভ করিবে।'

* * *

কিন্তু সে কোন্ পথ? সে কোন্ দেশ? বৃথা বিভীষিকায় ভয় পাইও না—হতাশ হইও না। দূরে নয়—দুষ্প্রাপ্য নয়; কল্পনার বহির্ভূত বা দৃষ্টির অতীত স্থানও নহে। ঐ দেখ,—সে দেশ তোমার সম্মুখেই বিদ্যমান্! ঐ দেখ,—সে দেশে উপনীত হইবার সরল সুগম পথ দেবতাই তোমাকে দেখাইয়া দিতেছেন! ঊষার আলোকে উদ্বুদ্ধ হও; জ্ঞানোন্মেষিণী দেবতার অনুসরণ কর; দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পারিবে, জানিতে পারিবে,—সে পথ সে দেশ কত দূরে! ঐ দেখ, দিব্য জীবন্ত সে দেশের সে পথের চিত্র জ্ঞানদেবতা তোমার চক্ষের উপর কেমন প্রতিভাত করিয়া রাখিয়াছেন! ঐ দেখ, দেবতাই তোমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন,—

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

দূরে নয়—এই নিকটেই—আকাশে অর্থাৎ সর্ব্বত্র যিনি বিদ্যমান্; অধিক বলিব কি, তোমার নিজের মধ্যেও যিনি নিত্য ক্রিয়মাণ; অপিচ, যিনি সকলই জানিতেছেন—যাঁহার অজানিত কিছুই নাই; সেই তেজোময় জ্ঞানময় পুরুষকে অবগত হওয়াই—তাঁহার শরণাগতি লাভ করাই—মুক্তির মোক্ষের বা অমরত্ব-লাভের প্রকৃষ্ট পথ; তদ্ভিন্ন মুক্তির মোক্ষের বা অমরত্ব-লাভের পথ আর দ্বিতীয় নাই।

* * *

শুনিলাম—বুঝিলাম—দেখিলাম; কিন্তু পথে অগ্রসর হই কি প্রকারে? জানিতেছি—বুঝিতেছি—দেখিতেছি—যিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বভূতাত্মা, তাঁহাকে জানিলেই—তাঁহাকে লাভ করিলেই—মৃত্যুঞ্জয়ী অমর হওয়া যায়। কিন্তু সে জানার—সে লাভ করার উপায় কি?—পদ্ধতি কি?—অবলম্বন কি? সংসারে যত কিছু বিতণ্ডা, সেই বিষয় লইয়াই।

ইহ-জগতে যে কিছু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, সকল সেই পথে অগ্রসর হইবার কল্পনাতেই। যাঁহার চিত্ত-দর্পণে যে ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তিনি সেই ভাবেই অন্যকে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন! ঐ যে যোগমগ্ন যোগী বল্মীকস্তূপে পরিণত হইতেছেন; ঐ যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী অনশনে দেহত্যাগ করিতেছেন; ঐ যে পরসেবাব্রতধারী, জীব-শিবে সমজ্ঞানে, জীবসেবায় জীবনপাত করিতে বসিয়াছেন; আর ঐ যে আত্মজ্ঞানী 'সোঽহং' চিন্তায় পরিমগ্ন রহিয়াছেন; এ সকলই সেই উপদেশের—সেই অনুভাবনারই ফল। ফলতঃ, যিনি যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, সকল কর্ম্মেরই লক্ষ্য অভিন্ন। নানা দিকে নানা ভাবে মনুষ্য সেই সন্ধানেই ধাবমান্ হইয়াছেন,—কি প্রকারে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায়!

* * *

এই উন্মাদনাই সংসারকে অসংখ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিয়াছে। সে কর্ম্ম-সমূহের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম নিকৃষ্ট বা কোন্ কর্ম্ম প্রকৃষ্ট, তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। নদ-নদী সরল কুটিল বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হয়। তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য—সাগর-সম্মিলন। হইতে পারে, তাহাদিগের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ দুস্তর মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া প্রাণহারা হয়; অথবা, কাহাকেও বা অপরের মধ্যে আত্মলীন করিতে হয়। কিন্তু সে বিতর্কের মধ্যে অগ্রসর না হইয়া, স্থূলভাবে আমরা কোন্ পথ লক্ষ্য করিতে পারি, তাহাই বিবেচনাধীন। সে পথ আর কিছুই নহে; সেই পথই শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—তোমায় দেখাইয়া দিতেছেন,—

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।"

———

জ্ঞান-বেদ।

———•:•:•———

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ

সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥

•.•

অতঃপর মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং
দ্যু-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

•.•

এক স্থানে—একটী মন্ত্র নহে; বেদে বিভিন্ন মন্ত্রে ধ্রুবা-স্বরূপ বিঘোষিত রহিয়াছে;—বিভিন্ন কর্ম্মে প্রার্থনার পর প্রার্থনায় প্রকাশ পাইয়াছে—"তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী দ্যৌঃ।" হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! হে অদিতিদেব! হে সিন্ধুদেব! হে পৃথিবীদেব! হে দ্যুদেব! অতঃপর আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

•.•

কিন্তু কে—সে দেবগণ? কোথায় তাঁহাদিগের অবস্থিতি? কিরূপেই বা তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন? মিত্র, বরুণ বা অদিতি-সম্বন্ধে মতান্তর উপস্থিত হইতে পারে। কেই বা মিত্র, কেই বা বরুণ, কেই বা অদিতি—এতদ্বিষয়ে বিতর্কও দেখিতে পাই। কিন্তু পৃথিবী, সিন্ধু ও দ্যুলোক (আকাশ) সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই ঐকমত্য দেখি না কি? আমাদিগের আবাস-ভূমি এই পৃথিবী—নিত্যকাল আমরা দর্শন করিতেছি; আবার এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া, নিম্নে জলরূপী সমুদ্র এবং ঊর্দ্ধে শূন্যরূপী আকাশ যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং এই তিনের সম্বন্ধে কোনই মতদ্বৈধের কারণ নাই।

* * *

কিন্তু প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। জিজ্ঞাসা করি,—তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন কি করিয়া? যে দৃষ্টিতে সচরাচর পৃথিবী প্রভৃতিকে দেখিয়া থাকি, তাহাতে পৃথিবীর বা সমুদ্রের বা আকাশের কি শক্তি আছে যে, তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন? তুমি সারাজীবন ধরিয়া পৃথিবীর—এই জলমৃত্তিকাময়া ধরিত্রীর—নিকট প্রার্থনা কর; তিনি কিছুতেই তোমায় রক্ষা করিতে পারিবেন না। এইরূপ, দ্যু বা আকাশ, সিন্ধু বা সমুদ্র, অথবা মিত্রই বল, আর বরুণই বল, আর অদিতিই বল, ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থিকঙ্কালসার করিলেও, কেহই তোমায় সাড়া দিবেন না,—কেহই তোমায় রক্ষা করিবেন না বা রক্ষা করিতে পারিবেন না।

* * *

তবে কি ঐ সকল দেবতার সম্বোধন বৃথা? তবে কি বেদ-মন্ত্র নিরর্থক? তবে কি যাঁহার যে শক্তি নাই, তাঁহাতে সেই শক্তির আরোপ করিয়া বেদ আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছেন? অবিশ্বাসী, নাস্তিকের মনে সহসা তাহাই ধারণা হয় বটে! কিন্তু একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে, ভ্রান্তি একেবারে অপনোদিত হয়। কি প্রকারে? তাহারই আভাস দিতেছি। তাঁহাদিগের (ঐ দেবতাগণের) জড়ত্বের বিষয় একটু বিস্মৃত হও দেখি! তাঁহাদিগের জড়ত্বের বিষয় ভুলিয়া গিয়া, দেবত্বের বিষয় অনুধাবনা করিয়া, যদি তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে পার, পরন্তু উপাসনা-

শব্দের অন্তর্ভূত নিগূঢ় অর্থের ধারণা-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকটে যদি একটু অগ্রসর হইতে পার, তবেই রক্ষা প্রাপ্ত হইবে। এ পক্ষে বুঝিবার প্রয়োজন,—দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব; বুঝিবার আবশ্যক,—ঐ এক এক দেবতার মধ্যে কি গুণ বা কি শক্তি আছে! আর প্রয়োজন,—তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা বা তাঁহাদিগের উপাসনায় সেই গুণের বা শক্তির কতটুকু অধিকারী হওয়া যায়। সেই গুণের বা সেই শক্তির সমীপস্থ হওয়া—অধিকারিতা-লাভই তাঁহাদিগের উপাসনা। কিন্তু কেবল পৃথিবী প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকা—উপাসনা নহে।

* * *

দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী আরও একটু বিশদ করিবার চেষ্টা পাইতেছি। মনে করুন—ঐ পৃথিবী! বিচার করিয়া দেখুন—কি গুণ বা কি শক্তির জন্য পৃথিবী-নামের সার্থকতা! সেই বুঝিয়া তাঁহার অনুসরণ করুন দেখি! অনুসরণ বলিতে, সেই গুণের বা সেই শক্তির অধিকারিত্ব-লাভ। পৃথিবী—ধরিত্রী—সর্ব্বংসহা—সকলেরই আশ্রয়দাত্রী। তুমি পৃথিবীর উপাসনা করিতে চাও? তাঁহার বহু গুণ শক্তির মধ্যে এই একটীর প্রতি প্রথম লক্ষ্য নির্দ্দেশ কর দেখি! তাঁহার উপাসনা বলিতে তাঁহার গুণের ও শক্তির অধিকারী হইতে হইবে। সংসারে যদি তুমি পৃথিবীর ন্যায় সহ্য-গুণের অধিকারী হইতে পার, শত্রু-মিত্রে ভেদ-জ্ঞান না করিয়া যদি তুমি সংসারের সকলকে আপনার করিয়া লইয়া আপনার ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে সমর্থ হও; তাহা হইলেই তোমার পৃথিবী-দেবতার উপাসনা করা সার্থক হইল! তাহাই উপাসনা। পৃথিবী-দেবতা যে তোমায় রক্ষা করিবেন, তোমার সেইরূপ উপাসনা দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়,—অন্যথায় নহে।

* * *

প্রত্যেক দেবতার স্বরূপ ও তাঁহাদিগের উপাসনা-সম্বন্ধে এই ভাব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। প্রথমে বুঝা আবশ্যক,—সেই সকল দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব কি? তাহা বুঝিয়া, তাঁহাদিগের গুণে গুণবন্ত এবং তাঁহাদিগের শক্তিতে শক্তিমন্ত হওয়াই তাঁহাদিগের উপাসনা! দেবতার উপাসনার ইহাই তাৎপর্য্য। গুণের ও শক্তির বিকাশ যেমন অসংখ্য অগণ্য প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে, দেবতাও সেইরূপ অসংখ্য-অগণ্য মূর্ত্তিতে সংসারে

বিচরণ করিতেছেন। যাঁহাকে ভগবান্ বা পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত করি, তিনি সেই সকলেরই সমষ্টিভূত। তিনি সর্ব্বস্বরূপ; সকল দেবতাই তাঁহার অন্তর্ভূক্ত। এ সংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাই, যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, সে সকলই তো তিনি, অথবা তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ! পৃথিবী বল, সমুদ্র বল, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি বল, সকলই তাঁহার রূপ। সংসারে যত কিছু গুণ বা শক্তি আছে, সকলই তাঁহার অভিব্যক্তি। সকল বিভূতিরই তিনি কেন্দ্রস্থল। সেই কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হওয়াই যদি লক্ষ্য হয়, তাহার পথ অন্বেষণ কর। সেই পথ—দেবতাগণের স্বরূপ-তত্ত্ব অনুধাবন, এবং তৎতত্ত্ব অনুধাবনে তদনুসরণে প্রবৃত্ত হওন।

* . *

মনে করুন,—সূর্য্য ও তাঁহার রশ্মিসমূহ। মনে করুন,—সমুদ্র ও তৎসম্মিলিত নদ-নদী-সমূহ। রশ্মিসমূহ যেমন তাহাদিগের কেন্দ্রস্থল সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করে; ভগবানের গুণ বা বিভূতি-সমূহ সেইরূপ সর্ব্বত্র দেবতা-রূপে বিস্তৃত হইয়া আছে। রশ্মির অনুসরণে যেমন তাহার কেন্দ্রস্থান সূর্য্যে পৌঁছান যায়; দেবগণের অনুসরণে - চরাচরব্যাপ্ত সদ্‌গুণাবলির অনুসরণে, সেইরূপ ভগবানে উপস্থিত হইবার সামর্থ্য আসে। সমুদ্র হইতে উত্থিত বাষ্পরাশি যেমন নদ-নদীর জনয়িতা, আবার নদ-নদীর সলিল-রাশি যেমন সমুদ্রে মিশিবার জন্যই ত্বরিত-গতি, ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত মানুষেরও সেইরূপ গতি-মতি-প্রকৃতি হওয়া আবশ্যক।

* . *

ফলতঃ, মিত্র-বরুণাদি যে সকল দেবতার বিষয় মন্ত্রে প্রখ্যাত দেখিতেছি, তাঁহাদিগের গুণ-শক্তির অনুসরণেই রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাই তাৎপর্য্য। দেবতার উপাসনা—দেবত্ব-লাভে প্রচেষ্টা।

———

জ্ঞান-বেদ।

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবযন্তস্ত্বেমহে।

উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানবঃ ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা॥

দেবতা নিদ্রিত আছেন। দেবভাব সুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা দেবসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। এ চিন্তা একবারও হৃদয়ে জাগিতে চাহে না। এ অবস্থার প্রতি আমাদের আদৌ দৃষ্টি পড়ে না। সংসারের নানা মোহ-জালে আমরা নিয়ত বিজড়িত থাকি। অশন বসন শয়ন ভোজন—এই সব লইয়াই আমরা নিয়ত বিব্রত আছি। দৈন্য-দারিদ্র্য অভাব-অনটন—তাহারাই আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে। তাহাদেরই সেবার জন্য, অভাব-অনটনের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, অপকর্ম্মের উপর অপকর্ম্ম করিয়া যাইতেছি,—আর সেই চিন্তাতেই দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে। দেবতা নিদ্রিত কি জাগ্রৎ—দেখিবার আর অবসর পাইলাম কৈ!

যদি এই চিন্তাও কখনও হৃদয়ে উদয় হয়, যদি এইরূপ ভাবনার রশ্মি-রেখা কখনও হৃদয়ে বিকাশ পায়; দেবতাকে ডাকিবার জন্য মানুষ তখনই ব্যাকুল হইয়া পড়ে,— তখনই সেই লোকপালক দেবতাকে সম্বোধন করিয়া মানুষ বলিতে পারে,—"উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবযন্তস্ত্বেমহে।" লোকপালক সেই ব্রহ্মণস্পতি-দেবতাকে জাগ্রৎ করিবার জন্য আহ্বান করিতে করিতে, ক্রমশঃ সকল দেবতাই হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন,—শত্রু বিমর্দ্দক দেবতা আসিয়া তখন শত্রুকে সকল বিপদকে দূরীভূত করেন। অতএব, আমা-দিগের প্রথম-আবশ্যক,— দেবতা কি ভাবে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য করা। সেই দিকে লক্ষ্য করিতে করিতেই দেবতার নিদ্রিত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে; আর, তখনই সুপ্ত দেবতাকে জাগ্রৎ করিবার স্পৃহা আসিবে। দেবতা জাগ্রৎ হইলেই সকল বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হইবে।

* * *

এই মন্ত্র সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। আমার সম্বন্ধে দেবতা নিদ্রিত আছেন—দূরে অবিস্থিতি করিতেছেন—এই ভাবটাও একবার হৃদয়ে উদয় হউক! তাহাতেও সুফল আছে। যখন সাধকের মনে এই ভাব জাগরিত হয়, তিনি অমনি ডাকেন,—"উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবযন্তস্ত্বেমহে।" সঙ্গে সঙ্গে অমনি তাঁহার অন্তরে প্রতিধ্বনি উঠে,—'উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানবঃ'! পরমদানশীল মরুদ্দেবগণকে তখন নিকটে আনিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। সাধক তখন প্রার্থনা করেন,— 'হে শোভনদাতা দেবগণ! আপনারা আসিয়া আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হউন।' দেবতার আগমন-পথে যে সকল অন্তরায় আছে, যে সকল শত্রু নানারূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া সে পথ আট-কাইয়া রহিয়াছে, তখন সেই পথের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। তখন শত্রুনাশক দেবতার শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যক হয়। সাধক তখন আবার ডাকেন,—'ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা।' অর্থাৎ—'হে দেবরাজ! আপনি আসিয়া শত্রুদিগকে নাশ করুন,—দেবগণের আগমন-পথের বাধা দূরীভূত হউক।' ফলতঃ, হৃদয়ে একটা দেবভাব একবার জাগাইবার চেষ্টা কর। তাহাতে সকল দেবতাই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন। বেদ-মন্ত্র এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে।

জ্ঞান-বেদ।

——ঃ*ঃ——

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।

প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥

* * *

'উচ্চকে অবনমিত করিতে হইবে, মানীর মান টুটাইয়া দিতে হইবে',—পৃথিবীব্যাপী এই একটা আন্দোলন চলিয়াছে। তজ্জন্য কোথাও আর শান্তি নাই। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে—আগ্নেয়গিরির আভ্যন্তরীণ জ্বালামালার ন্যায় বিদ্বেষের ভাব-প্রবাহ অধুনা সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল দেখিতেছি। ভারতবর্ষে এই ভাবের অভিব্যঞ্জনা দেখিতে পাই—প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষে।

* * *

'ব্রাহ্মণগণ ঘোর স্বার্থান্বেষী ছিলেন! তাঁহাদিগের রচিত শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ —কেবল তাঁহাদিগেরই সুখ-সম্পৎ প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিধিবিধান প্রবর্ত্তন

করিয়া গিয়াছে!' এই একটা ভ্রম-ধারণা আজকাল অনেকের মনে ক্রিয়া করিতেছে! ব্রাহ্মণেতর প্রায় সকল জাতিই—এমন কি অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান পর্য্যন্ত—এই ভ্রম-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণকে অবনমিত করাই তাঁহাদের লক্ষ্য এখন। ফলে, দেশ-মধ্যে একটা নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন একটা রেষারেষী দ্বেষাদ্বেষী দলাদলি প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দেখিতে পাইতেছি।

* * *

যাউক সে কথা। যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলিবার চেষ্টা পাই-তেছি। ব্রাহ্মণগণের উপর যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া সমাজ-শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হইতেছে, প্রসঙ্গতঃ তৎসম্পর্কে দুই এক কথার আলোচনা করিতেছি। বেদ—সকল শাস্ত্রের শিরোমণি। তাহার উপর আর কোনও শাস্ত্রবাক্য তিষ্ঠিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রে ব্রাহ্মণগণ কি প্রার্থনা জানাইতেছেন, একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন দেখি! দেবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন,—'ব্রাহ্মণগণের প্রিয়কার্য্যের জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি না, রাজন্যবর্গের প্রিয়কার্য্যের জন্যও আমরা প্রার্থনা করি না। হে দেবগণ! সকল সমাজের সকলেরই যাহাতে সমভাবে প্রিয় সাধিত হয়, আপনারা তাহাই করুন। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি আর্য্য, কি অনার্য্য—সকলেরই যেন সমভাবে হিতসাধন হয়।'

* * *

যাঁহারা সর্ব্বলোকের হিতকামনায় এইরূপ প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হন; পরন্তু পার্থিব সম্পদ্-বিভবকে তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যাঁহারা মুষ্টি-ভিক্ষায় জীবন যাপন শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান করেন; সেই ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবের উন্মেষণ করা—ইহার মধ্যে কি নিগূঢ় কোনও কারণ বিদ্যমান নাই! যেখানে সত্যের আদর, যেখানে ত্যাগের আদর্শ, সেখানেই প্রভাবের পরাকাষ্ঠা। ব্রাহ্মণ যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহাদিগের ন্যায়নিষ্ঠার আত্ম-ত্যাগের পরহিতসাধনব্রতের সত্যপরায়ণতার বিজয়-পতাকা-মূলে তখন ভারতের সকল সম্প্রদায়ই সর্ব্বতোভাবে সমবেত হইত। সুতরাং বিদেশী বিধর্ম্মী কাহারও কখনও সাধ্য ছিল না যে, ব্রাহ্মণের প্রভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠান্বিত হয়! বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদির সম-সাময়িক

বিবরণ স্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইলেও, ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে না কি,—এই সেদিনও—কলির পূর্ণ প্রভাবের মধ্যেও—দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্যের অঙ্গুলি-হেলনে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য কিরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! ত্যাগের আদর্শ ব্রাহ্মণ দেশের মস্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রভাব দিগন্তবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণ—কক্ষচ্যুত; সুতরাং জাতীয়-জীবন বিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ।

* * *

জাগো ব্রাহ্মণ!—আবার জাগো! আবার সেই বেদমন্ত্রে প্রার্থনা জানাও,—"প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে।" তোমাকে যে যতই অবহেলা করুক, তুমি কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য কদাচ ভুলিও না। তুমি কিন্তু নিয়ত প্রার্থনা কর,—"জগতের সকলের মঙ্গল হউক।" ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ-জ্ঞান তোমাতে যেন স্থান না পায়। তাহাই তোমার জাগরণ। তোমার সেই জাগরণেই দেশ আবার জাগিবে,—তোমার সেই জাগরণই দেশে পুনঃ শান্তি আনয়ন করিবে। তোমার সেই জাগরণই তোমার ব্রাহ্মণত্ব। ঐ দেখ, বেদ-মন্ত্র তোমায় সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছেন; স্মরণ করাইতেছেন,—

জাগো—জাগো হে ব্রাহ্মণ।
তুমি না জাগিলে, জাগিবে না অন্য জন।
কোথা সে দেবত্ব—কোথা সে মহত্ব—কোথা সে ত্যাগের আদর্শ মহান্।
দেবতার হিতে, দধীচি হইয়ে, যে আদর্শে করেছিলে অস্থিদান॥
দেখাও বীরত্ব—দেখাও বিক্রম—যে বীর্য্য-বিক্রমে নিঃক্ষত্রিয় হইল ধরা।
পরশুরামের কুঠার আবার ধরহ করেতে—চকিত হৌক অমরা॥
সংসার ব্যাপিয়া দেব-মানবের সমর-আরাব উঠিছে ভীষণ।
শুনিয়া না শোন, নীরব বা কেন, দেব-হিতে প্রাণ কর সমর্পণ॥
ত্যাগের আদর্শ দেখাও আবার—দেখাও তোমার বীরত্ব-বিক্রম যত।
তোমার আদর্শে জাগিবে এ জাতি—পদাঙ্ক-গমনে কভু হবে না বিরত॥
জাগো—জাগো হে ব্রাহ্মণ!
তুমি না জাগিলে জাগিবে না অন্য জন॥

— • —

জ্ঞান-বেদ।

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ

নমঃ পূর্ব্বজায় চাপরজায় চ।

নমো মধ্যমায় চাপগল্‌ভায় চ

নমো জঘন্যায় চ বুধ্নায় চ॥

* * *

জ্যেষ্ঠই হউন, আর কনিষ্ঠই হউন, পূর্ব্বজই হউন, আর মধ্যমই হউন, অপরজই হউন, আর অপগল্‌ভই হউন, জঘন্যই হউন, আর বুধ্নই হউন,—সকল দেবতাই সকলের পূজ্য ও নমস্য। দেবতায় ইতর-বিশেষ নাই। দেবভাব বা সত্ত্বভাব যেখানেই পরিদৃষ্ট হইবে;—তা মানুষেই হউক, আর পশুতেই হউক, স্থাবরেই হউক, আর জঙ্গমেই হউক, জড়েই হউক, আর চেতনেই হউক, প্রাণিতেই হউক, আর উদ্ভিদেই হউক; যেখান হইতেই দেবভাবের বিকাশ পাইবে;—যাহার নিকট হইতেই দেবভাব-সঞ্চয়ের সম্ভাবনা দেখিবে; তাহাকেই তোমার নমস্য বলিয়া মনে করিবে,—তাহারই নিকট হইতে সেই ভাবের অনুপ্রাণনায় উদ্বুদ্ধ হইবে।

* * *

ক্ষুদ্র আমি; সহসা বৃহৎকে আয়ত্ত করিতে পারিব কেমন করিয়া? পঙ্গু আমি; একেবারেই গিরি-লঙ্ঘনের আশা—আমার পক্ষে দুরাশা নহে কি? আমি যেমনটী, আমার অবলম্বন বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাই তেমনটীই হওয়া প্রয়োজন! আমার বুঝিয়া দেখা উচিত—আমি যেমন ক্ষুদ্র, তেমনই আমার উপযোগী বস্তুর সাহায্যেই আমাকে বৃহতে পৌঁছিতে হইবে। ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়াই যে বৃহতে উপনীত হওয়া যায়, প্রকৃতির রাজ্যে এ দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই। ক্ষীণাঙ্গী তটিনীর মধ্য দিয়াই অনন্ত মহাসমুদ্রে অগ্রসর হইতে পারি; ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই দিগ্দাহী অনলের সৃষ্টি হইতে পারে। ফলতঃ, সৎসঙ্কল্প-সিদ্ধির সহায়তা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা যেখানেই আছে, ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক, তাহারই অনুসরণে শ্রেয়ঃ অধিগত হইতে পারে। সুতরাং ক্ষুদ্র বৃহৎ কেহই উপেক্ষণীয় নহে;—যেখানে যে সম্ভাব আছে, তাহাই পরিগ্রহণীয়। ক্ষুদ্র বলিয়া ক্ষুদ্রকে অবহেলা করিতে নাই। পরন্তু তাহার মধ্যে যেটুকু সদ্বস্তু আছে, তাহাই গ্রহণ করার আবশ্যক দেখি। বেদ-মন্ত্রে তাই ক্ষুদ্র-বৃহৎ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সকলকেই সমভাবে নমস্কার জানান হইয়াছে।

* * *

এ নমস্কারের লক্ষ্য—ক্ষুদ্রত্বে বা বৃহত্বে নহে; পরন্তু বুঝিতে হইবে,—ক্ষুদ্রত্বের ও বৃহত্বের মধ্যে যে মহত্ত্বটুকু আছে, এ নমস্কার তাহারই উদ্দেশ্যে। আমাদিগের মধ্যে নিত্য-সংঘটিত চির-আচরিত একটী দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা পাইতেছি। মানুষ মানুষকে গুরুত্বে বরণ করেন,—দেবতা-জ্ঞানে তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা করেন। অধিক কি, "অখণ্ডমণ্ডলাকারং" ইত্যাদি মন্ত্রেও গুরু-প্রণাম বিহিত আছে। দেখিলে মনে হয়,—যেন পর-ব্রহ্মের অর্চ্চনা করা হইতেছে। গুরুগাতায় গুরুর যে সকল লক্ষণ ও নাম আছে, তাহাতে গুরু ও পরমেশ্বর অভিন্ন বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু ইহাতে কি বলিবেন? বলিবেন কি—গুরুই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হইয়াছেন? কখনই নহে। এখানে বুঝিতে হইবে—এ সকলের মূল লক্ষ্য কি! অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে—এতদ্দ্বারা আমরা কি অশংসয়িত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি!

* * *

এ সকল ক্ষেত্রে একটীকে অবলম্বন করিয়া অপরটীকে পাইবার প্রয়াস বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। মানুষকে 'অখণ্ড-মণ্ডলাকার' বলায় মানুষ কখনই অখণ্ডমণ্ডলাকার হয় না; অথবা, কাহাকেও বিমুক্ত বা শিব বলিলেই তিনি তাহা হয়েন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন—তবে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করাই—এখানকার লক্ষ্য। যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, যাঁহাকে আদর্শ বলিয়া মনে হয়, আমার নিজের অপেক্ষা তাঁহাতে ভগবদ্বিভূতি অধিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল আছে—ইহা মনে করা স্বাভাবিক। জ্ঞানীর নিকটই জ্ঞানলাভ হয়, দীপ হইতেই দীপ প্রজ্বালিত হইয়া থাকে, জলাশয় হইতেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, আমার নিকট যিনি জ্ঞানী, আমার পক্ষে যিনি দীপস্বরূপ, আমার সম্বন্ধে যিনি প্রশান্ত সরোবর, আমার অজ্ঞানতার আঁধার দূর করিবার জন্য, আমার অন্ধকারময় গন্তব্য পথে আলোকবর্ত্তিকা ধরিবার জন্য, আমার পিপাসার্ত্ত শুষ্ককণ্ঠে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধবারি প্রদানের নিমিত্ত, আমি তাঁহারই দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকি। তার পর, ক্রমে তাঁহার দ্বারাই, তাঁহার নিকট সন্ধান পাইয়াই, আমি অনন্ত-জ্ঞানের অনন্ত আলোকের অনন্ত মহাসমুদ্রের নিকট পৌঁছিবার আশা রাখি। এই দৃষ্টিতেই, যে অবলম্বনের দ্বারা মূল-ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতেও মূল-ক্ষেত্রত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। নচেৎ, এ আর অন্য কিছুই নহে; এ কেবল—পঙ্গুর অবলম্বন-যষ্টি মাত্র। যষ্টি নিজে যে তোমায় বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহা নহে; তাহাকে অবলম্বন-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তুমি নিজে অগ্রসর হইতে থাক। অপরের সাহায্যে একটু আত্মশক্তিসঞ্চার—লক্ষ্য এই মাত্র,—তা সে ক্ষুদ্রই হউক, আর বৃহৎই হউক। ক্ষুদ্র-বৃহৎ বা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ—এই যে সকলের নমস্কার, ইহারও লক্ষ্য আর কিছুই নহে। লক্ষ্য—যেখানে যে কিছু সত্ত্ব আছে; সকলেই আসিয়া আমাতে মিলিত হউক,—বিন্দু বিন্দু অমৃতের সঞ্চারে আমাকে অমৃতময় করিয়া তুলুক। সে সত্ত্ব ক্ষুদ্রের মধ্যেও আছে, আবার মহতের মধ্যেও আছে, তাই ক্ষুদ্র-মহৎ সকলকেই আমরা নমস্কার করি। সকলেরই অন্তর্ভূত সত্ত্ব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক,—ইহাই ঐ নমস্কারের বা তদন্তর্গত প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা।

জ্ঞান-বেদ।

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসং।

ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥

ভক্ত সাধক এই মন্ত্রে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনাদের অনুধ্যানে—আপনাদের অনুস্মরণে, আমাদের মনে যেন ঐকান্তিকী ভক্তির সঞ্চার হয়; আর, সেই ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে, জ্ঞানাগ্নির স্ফুরণে, আমরা যেন তাহাতে অন্তরের শত্রুসমূহকে—কাম-ক্রোধাদি রিপু-সমূহকে—আহুতি-প্রদানে সমর্থ হই।'

জ্ঞান—ভক্তির অনুসারী। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় না। আবার জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই অভিন্ন,—উভয়েরই ভিত্তি কর্ম্ম। ভক্তিতত্ত্ব নিরতিশয় দুরধিগম্য। সেই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার সাযুজ্য-লাভ পর্য্যন্ত অধিগত হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

'ভক্তির দ্বারাই ভক্ত আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে। আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারিলেই সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।'

তিনি আরও বলিয়াছেন,—'যদি দুঃখনিবৃত্তি ও সুখশান্তি লাভ করিতে চাও, মদ্গতচিত্ত হও। আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর; আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও; আমাকে নমস্কার কর; এবম্প্রকারে আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া আমার অনুসরণ করিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে! আমাকে প্রাপ্ত হইলে, তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে; তুমি পরমানন্দ-লাভে সমর্থ হইবে। আমার প্রতি নিষ্ঠাবান্, আমার প্রতি শরণাগত ব্যক্তিগণ, আমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন এবং পরম আনন্দ লাভ করেন এবং পরিশেষে আমাতেই লীন হন।'

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

* * *

ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা, ভক্তি-সহকারে তাঁহার ভজনা করা,—ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধির ইহাই একমাত্র উপায়। শাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানের প্রতি মন সন্ন্যস্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'আমি সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ পুরুষ। আমার সেই স্বরূপ তত্ত্ব একমাত্র ভক্তির দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। আমার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইলে, সাধক সম্পূর্ণরূপে আমার জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। আমার জ্ঞান লাভ করিলে, সাধক ও আমি অভিন্ন হই। সাধক আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হন।' ফলতঃ, ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারিলেই সকল দুঃখের অবসান হয়। ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া প্রয়োজন। ভক্তির স্বরূপ, ভক্তির লক্ষণ এবং ভক্তের কার্য্য প্রভৃতির বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইলে, আর তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিলে, চিরসুখলাভ বা মুক্তি আপনিই অধিগত হয়। ভক্তি কি—প্রথমে তাহাই বুঝিবার প্রয়োজন। ভক্তির নানা পর্য্যায়—নানা সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকী আনুরক্তিই প্রকৃত ভক্তিপদবাচ্য। শাস্ত্রে ভক্তির বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সে সকল লক্ষণেরই সার তত্ত্ব—ঐকান্তিকতার সহিত,

একপ্রাণতার সহিত, ভগবানের প্রতি আনুরক্তি। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ নিম্নরূপে পরিবর্ণিত রহিয়াছে ; যথা,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

* * *

শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীভগবানের প্রীতির কর্ম্ম করিতে হইবে। সে কর্ম্ম 'অন্যা-ভিলাষিতাশূন্য' অর্থাৎ অন্য সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ বা কামনা বর্জ্জিত হওয়া চাই। আর হওয়া চাই—'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত' অর্থাৎ তাহা যেন জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়। ভগবানের প্রতি যে ঐকান্তিকী ভক্তি, তাহা জ্ঞানের অধীন নয়, কর্ম্মের অধীন নয়। অর্থাৎ,—'জ্ঞান-কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই উত্তমা ভক্তি।' সাণ্ডিল্য-সূত্রে আছে,—"সাপরানুরক্তীশ্বরে।" ভগবানে অনুরাগই ভক্তি। ভগবানের প্রতি অনুরাগ আর কি হইতে পারে? ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন। তাই ভগবান্ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন —

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ॥"

* * *

'যিনি আমার প্রিয়কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।' কিন্তু তাঁহার (ভগবানের) আবার প্রিয়কর্ম্ম কি? পণ্ডিতগণ বলেন— তাঁহার প্রিয়কর্ম্ম—তাঁহার উদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম্ম। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে অনন্যা ভক্তি জন্মে, ভগবৎ-প্রাপ্তির তাহাই একমাত্র উপায়। ভক্ত সাধক সৎকর্ম্মদ্বারাই ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তদ্দারাই তিনি সর্ব্বপ্রকারে অসৎ-সঙ্গবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিত্যমুক্ত হইতে পারেন।

জ্ঞান-বেদ।

—:—:*:—:—

অতঃ পরিজ্‌মন্নাগহি দিবো বা রোচনাদধি।

সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ॥

* • *

আমরা মুখে বলি—তিনি সর্ব্বব্যাপী। অথচ, আমাদের চিত্ত নিত্য সংশয়ান্বিত – তিনি এখানে আছেন, কি সেখানে আছেন, দ্যুলোকে আছেন —কি আদিত্য-মণ্ডলে আছেন! এই সংশয়ই মানুষের প্রকৃতি। মন্ত্রে মানুষের মনের এই প্রতিচ্ছবি স্বভাব-সুন্দর-ভাবে প্রকটিত রহিয়াছে।

* • *

ডাকিতেছি—'হে সর্ব্বব্যাপিন্!' অথচ, প্রার্থনার সময় কহিতেছি—'তুমি দ্যুলোকে, কি অন্তরিক্ষ-লোকে, অথবা দীপ্তিমান্ সূর্য্যলোকে, যেখানেই থাক, এই যজ্ঞে আগমন কর।' তবেই বুঝা যায়—দৃঢ়বিশ্বাস এখনও জন্মে নাই, সংশয়-সাগরে পড়িয়া চিত্ত-তরী এখনও হাবুডুবু খাইতেছে। অজ্ঞান-অমার প্রগাঢ় অন্ধকারে খণ্ডমেঘ-মধ্যে এক একবার জ্ঞানের বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হইতেছে বটে; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মেঘান্তরালে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

* • *

'আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার মহিমা কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়াছি; আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন।' এ উক্তি—সাধারণ মানুষের সাধারণ ধারণার অন্তর্ভুক্ত! মানুষ মনে করে যে,—'আমরা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি বা স্তব করিতেছি; তাহা হইলেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন।' হায় ভ্রান্ত! তাঁহার আবার মহিমা কীর্ত্তন করিবে কি? যিনি সকল মহিমার আশ্রয়ভূত, যাঁহা হইতে সকল গুণ সকল বিশেষণ উৎসরিত, তাঁহাকে আবার কি বলিয়া মহিমান্বিত করিবে? যিনি সকলের বড়—যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ—তাঁহাকে বড় বলিলে বা শ্রেষ্ঠ বলিলে তাঁহার মহিমা বাড়ান হয় কি? সম্রাট্‌কে সম্রাট্‌ বলিলে, তাহাতে তাঁহার মহিমা বাড়ে না, অথবা তাহাতে তাঁহার কিছু আসে-যায় না। বিশেষতঃ ভগবানের সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য লাভ প্রভৃতি মানুষের যাহা লক্ষ্য, কেবল গুণ-বিশেষণের উচ্চারণে অথবা কেবল মহিমা-কীর্ত্তনে সে লক্ষ্য কখনও সিদ্ধ হয় না। কীর্ত্তনে, স্মরণে, অনুধ্যানে—তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইবার প্রযত্ন আসে। সেই প্রযত্নের ফলে, সৎকর্ম্মাদির সাধনে, সিদ্ধি করতলগত হয়। ইহাই সাধন-ফল-প্রাপ্তির ক্রম-পর্য্যায়!

* * *

এ মন্ত্রে সাধারণ-দৃষ্টিতে সাধারণ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইলেও, ইহার নিগূঢ় লক্ষ্য—স্তুতির সম্যক্ প্রসাধন (গিরঃ সম্ ঋঞ্জতে)। প্রসাধন শব্দের অর্থ—সম্পাদন। স্তুতির সম্যক্ প্রসাধন বা সম্পাদন—ইহার তাৎপর্য্য কি? তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া বা তৎকর্ম্মে কর্ম্মান্বিত হওয়া। বলিতেছি—তুমি সৎ। আকাঙ্ক্ষা—সাযুজ্য-লাভ। কিন্তু কেবল মুখে 'সৎ সৎ' বাক্য উচ্চারণ করিলেই কি সাযুজ্য-লাভ হইতে পারে? কখনই না। 'সৎ সৎ' বলিতে বলিতে, সদ্বৃত্তির সাধনায় সৎ হইতে হইবে। তবে তো সাযুজ্য-লাভ সম্ভব হইবে! তুমি ন্যায়পর, আমি তোমার স্বারূপ্য পাইতে চাই; তৎসঙ্কল্প-সাধনে আমাকেও ন্যায়পর হইতে হইবে। ইহাই স্বারূপ্য-লাভের লক্ষ্য। এইরূপ, তাঁহাতে যে যে গুণের আরোপ করি, সেই সেই গুণের অধিকারী হওয়াই স্বারূপ্য-লাভ। 'স্তুতি সম্যক্ প্রকারে সম্পাদন করি' প্রভৃতি বাক্যের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের ভাব আসিতেছে। কেবল মুখে স্তুতিগান করিয়া নিরস্ত হইলে হইবে

না ;—কার্য্যে তাহার সাফল্য দেখাইতে হইবে। যাঁহারা সে সাফল্য দেখাইতে পারেন, তাঁহাদেরই বলিবার অধিকার আছে—'হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনি যেখানেই থাকুন, আমার এই যজ্ঞে আগমন করুন।'

* * *

স্তব-স্তুতির লক্ষ্য—যাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাঁহার সন্তোষ-সাধন। কিন্তু কেবল বাক্যে কি সন্তোষ-সাধন সম্ভবপর ? মুখে যদি 'প্রভু' 'প্রভু' বলি, আর কার্য্যে যদি অন্যায়াচার করি, প্রভু কি তাহাতে পরিতুষ্ট হন ? একটী গল্প আছে ! এক উদ্যান-স্বামী, আপনার উদ্যানের কর্ম্মের জন্য দুই জন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুই জনের উপর উদ্যানের দুই দিকের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু উদ্যানের কার্য্যে গিয়া, একজন ভৃত্য শুধুই উদ্যান-স্বামীর গুণ-কীর্ত্তনে রত থাকিত, উদ্যানের কার্য্য বড় একটা দেখিত না ; অন্য দিকে, অপর ভৃত্য. প্রভুর আদেশ-পালনে, উদ্যানের বৃক্ষলতা-গুলিকে যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই জীবন নিয়োগ করিয়াছিল। ফলে, উদ্যানের একটী দিক্ আগাছায় পরিপূর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, এবং অপর দিক্ ফল-ফুলে শোভা বিস্তার করিয়াছিল। এ অবস্থায়, উদ্যান-স্বামী উদ্যান দেখিতে আসিয়া, কোন্ ভৃত্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন ? সহজেই বুঝা যায়, যে ভৃত্য তাঁহার উদ্যানের পারিপাট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তিনি তাহাকেই পুরস্কৃত করিবেন। এ ক্ষেত্রেও সেই ভাবই বুঝিতে হইবে। সংসার-রূপ উদ্যানে তিনি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়া-ছেন—তাঁহার উদ্যানের পারিপাট্য রক্ষার জন্য। উদ্দেশ্য – আগাছাগুলিকে তুলিয়া ফেলিবে ; উদ্যান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে ; উদ্যানের আবর্জ্জনা দূরে ফেলিয়া দিবে ; এবং ভাল ভাল ফুলফলের গাছগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিবে। তাহাতেই তাঁহার সন্তোষ ; তাহাতেই তিনি পুরস্কৃত করিবেন।

* * *

এই মন্ত্রে দুই শ্রেণীর সাধকের দুই ভাব ব্যক্ত দেখি। এই মন্ত্রটিতে সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রকৃতি যেরূপ পরিস্ফুট, অসাধারণ মানুষের অসাধারণ শক্তি-প্রভাবও সেইরূপ পরিদৃশ্যমান্ ! যাঁহারা সাধারণ পন্থা-বলম্বী, তাঁহাদের আহ্বান,—'আমরা আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি ; আপনি আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন ; আপনার অধিষ্ঠানে আমাদের যজ্ঞ

সুসম্পন্ন হউক।' কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মমার্গে অগ্রসর, জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা বলিতেছেন,—'আমরা আমাদের কর্ম্মপ্রভাবে আপনাকে এই যজ্ঞে আনয়ন করিবার প্রার্থী।' আহ্বান উভয়েই করিতেছেন। এক জনের আহ্বান—নৈরাশ্যব্যঞ্জক, অন্যের আহ্বান—আশা-আশ্বাস-পূর্ণ। প্রথম শ্রেণীর সাধক অনুগ্রহ-প্রার্থী—দয়ার ভিখারী। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক কেবল অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন না; পরন্তু সাধনা প্রভাবে ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া আনাই তাঁহার কামনা।

* * *

যজ্ঞ—অন্তরে বাহিরে উভয়ত্র আরম্ভ হইতে পারে। মনে করিতে পারি, যিনি যে ভাবের ভাবুক, তিনি সেই ভাবেই ডাকিতেছেন,—'হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন।' হৃদয়ে ও যজ্ঞক্ষেত্রে উভয়ত্রই অভাব অনুভূত হইতে পারে। তিনি সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্রে তিনি অনুপস্থিত। তিনি থাকিতে পারেন—অন্তরিক্ষ লোকে; তিনি থাকিতে পারেন—দ্যুলোকে; তিনি থাকিতে পারেন—আদিত্য-মণ্ডলে; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্র (হৃদয়) যে শূন্য পড়িয়া আছে! সর্ব্বত্র তিনি; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্র (হৃদয়) শূন্য কেন? এবম্বিধ অনুভাবনার পরই কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে। কর্ম্ম প্রবৃত্তি, অবসাদ দূর করিয়া দেয়। এখানে সাধক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং ডাকিবারও সামর্থ্য আসিয়াছে—'যেখানে থাকুন, এই যজ্ঞে আগমন করুন।'

* * *

কীর্ত্তনে স্মরণে অনুধ্যানে কোনও সুফল যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। কীর্ত্তন স্মরণ অনুধ্যানাদির দ্বারা তৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্যম আসে। কীর্ত্তনে স্মরণ হয়—প্রভু আমায় কি জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে অনুধ্যান আসে—কেমন করিয়া সে কর্ম্ম সম্পাদন করিব! তখন কর্ম্ম আরম্ভ হয়। পরে স্তরে স্তরে কর্ম্মানুসারে আশা-আশ্বাসের সঞ্চারে সমীপস্থ হইবার সামর্থ্য আসে।

জ্ঞান-বেদ।

—————•: • :•—————

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্‌পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

• • •

এক বৃক্ষে দুটী পক্ষী নিবসয়ে সুখে।
একে ফলভোগ করে—অন্য মাত্র দেখে॥

• • •

তিনি দেখিতেছেন। আমরা কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। তাঁহারই অঙ্গীভূত অংশগত হইয়া আমরা কর্ম্ম-ঘোরে আবদ্ধ হইতেছি; তিনি মাত্র লক্ষ্য করিতেছেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না;—আপনার অজ্ঞাতসারে —মোহ-মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া—অপকর্ম্মের পর অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেছি; কিন্তু ভ্রমেও একবার চাহিয়া দেখিতেছি না যে, একজন উপর হইতে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া রহিয়াছেন!

• • •

সেই দৃষ্টির প্রতি যদি লক্ষ্য পড়ে; আমাদিগের প্রতি কর্ম্মে যদি দেখিতে পাই,—সেই এক জনের চক্ষু আমাদিগের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে; তাহা হইলে কখনও কোঁনও অপকর্ম্মে আমাদিগের চিত্ত প্রবৃত্ত হইতে পারে না;—তাহা হইলে কখনও কোনও ভ্রান্ত-পথে আমরা আর পরিচালিত হই না। দ্রষ্টার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই কর্ম্ম-ঘোর কাটিয়া যায়। সেই দৃষ্টিই—পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিই দ্রষ্টার নিকটে দর্শিতকে লইয়া যায়। সেই দৃষ্টির প্রভাবেই—জীব মুক্তি লাভ করে; ব্যষ্টি সমষ্টিতে মিলিয়া যায়।

• • •

এ বিষয়ে সুন্দর একটী গল্প আছে। পত্রান্তর হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। দুটী ছেলে একজন আচার্য্যের কাছে এসেছিল—ধর্ম্ম শিক্ষা কর্‌তে। আচার্য্য বল্‌লেন—পরীক্ষা না করে তিনি তাদের কিছু শিখাবেন না। এই বলে তিনি তাদের দুটী পায়রা দিয়ে বল্‌লেন,—"এমন জায়গায় গিয়ে এ পায়রা দুটী মার্‌বে, যেখানে কেউ তোমাদের দেখ্‌তে না পায়।" এক জন তখনই লোক-চলাচলের মাঝ দিয়ে চল্‌ল। কত লোক যাচ্ছে আস্‌ছে। সে তাদের দিকে পেছন ফিরে, একটা কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে পায়রাটার মুণ্ড ছিঁড়ে, আচার্য্যের কাছে এসে বল্‌ল—"প্রভু, আপনার আদেশ পালন করেছি।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"পায়রাটা মার্‌বার সময় কেউ তো তোমায় দেখ্‌তে পায়নি?" সে বল্‌ল,—"না। ওকে মারবার সময় আমি কারুকে দেখতে দিই-নি।" আচার্য্য কহিলেন,—"আচ্ছা, বেশ; দেখা যাক, তোমার সঙ্গীটী কি করেছে!"

* * *

তাহার সঙ্গীটি—সেই অপর ছেলেটী—এক গভীর জঙ্গলে ঢুকে যেই পায়রাটার ধার মোচকাতে যাবে, অমনি দেখে,—ওর টল্‌টলে চোখ-দুটী যে তারই পানে তাকিয়ে রয়েছে! ওই চোখ দুটীর পানে চেয়ে, সে পায়রাটার ঘাড় মোচ্‌কাতে গেল; কিন্তু পার্‌ল না—তার মনে ভয় এলো। হঠাৎ তার মনে হ'ল, আচার্য্য তো তাকে নেহাৎ সোজা কাজটী দেন-নি। সাক্ষী যে—দ্রষ্টা যে—সে যে এই পায়রাটির মাঝেও রয়েছে। "আমি তো একা নই—এ জায়গা তো এমন নয় যে,—কেউ আমায় দেখ্‌তে পাবে না!—কোথাই যাই—কি করি?" এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে আর একটা জঙ্গলে গিয়ে সেখানেও যেই পায়রাটাকে মার্‌তে যাবে, অমনি তার চোখের দিকে দৃষ্টি পড়্‌ল—পায়রাটা যে দেখ্‌ছে তাকে!—দ্রষ্টা যে পায়রার মাঝেই! বারবার সে পায়রাটাকে মার্‌বার চেষ্টা কর্‌ল। কিন্তু তার আচার্য্য তাকে যে ভাবে মার্‌তে বলেছিলেন, সে ভাবে তো পার্‌ল না। হতাশ হয়ে সে পায়রাটাকে নিয়ে আচার্য্যের কাছে ধীরে ধীরে ফিরে এল।

* * *

আচার্য্যের পায়ের কাছে পায়রাটা রেখে, সে কেঁদে বল্‌ল—"প্রভু, আপনি যা আদেশ করেছিলেন, তা আমি কর্‌তে পার্‌র না। দয়া করে

আমায় ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন। এমন করে আর পরীক্ষা কর্‌বেন না। আমি পরীক্ষার যোগ্য নই। আমায় কৃপা করুন, কৃপা করে আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দেন; আমি তাই শুধু চাই।” আচার্য্য তখন ছেলেটীকে কোলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে বল্‌লেন,—“বাছা, আজ যেমন, যে পাখাটাকে মার্‌তে গিয়েছিলে, তার চোখেও তুমি দ্রষ্টাকে দেখ্‌তে পেলে; তেমনি, যেখানেই যাও না কেন, যদি কখনও কোনও প্রলোভন আসে, কোনও অসৎ কাজ কর্‌তে যাও, অমনি ভগবান্ যে তোমার সাম্‌নে, সে কথা স্মরণে রেখো। যদি কোনও নারীর দিকে তোমার মন যায়, তবে তার দেহে তার চোখে সেই দ্রষ্টাকেই দেখ্‌তে শিখো;—জেনো, তোমার প্রভু তারই চোখ দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রভু তোমায় সব সময় দেখ্‌ছেন। এমনি ভাব নিয়ে কাজ করো, যেন তুমি প্রভুর চোখের সাম্‌নে রয়েছ, মুখোমুখী হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছ—প্রিয়তমের দৃষ্টি তোমাকে এক পলের জন্যও ছেড়ে যায়-নি। বৎস, জেন,—ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা।”

* * *

সংসারে যিনি যে কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হউন, প্রতি কর্ম্মেই তাঁহার মনে করা উচিত,—তাঁহার অলক্ষ্যে এক জন সে কর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই জ্ঞান থাকিলে, মানুষকে কখনই বিভ্রমগ্রস্ত বা বিপন্ন হইতে হয় না। যাঁহারা ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁহারা সর্ব্বদাই উপরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কখনও মুহ্যমান হইতে হয় না। সকল শাস্ত্রই তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি;—

“ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতা পুত্থানুপুত্থবিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি।
সঙ্গীতবাদ্যলয়তালবশাং গতাপি মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥”

—•—

জ্ঞান-বেদ।

—:*:*:*:—

সঙ্ঘোদয় চিত্র মর্ব্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যং।

অসদিত্তে বিভু প্রভু॥

• • •

ভগবানের নিকট প্রার্থনার সময়, মানবের হৃদয়ে সাধারণতঃ দ্বিবিধ সুখ-ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হয়। প্রথমতঃ, তাহারা ভোগের উপযোগী পর্য্যাপ্ত ধনৈশ্বর্য্য চায়। দ্বিতীয়তঃ, সেই পর্য্যাপ্তেরও অধিক—পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের অতীত—অন্য ধন তাহারা পাইবার কামনা করে!

• • •

ভোগের আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত প্রকারের। সে আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। সুতরাং ধনাদির প্রকার-ভেদেরও অবধি দেখি না। চাই—অর্থ, চাই—মণি-মাণিক্য-হীরা জহরত, চাই—ঘর-বাড়ী গাড়ী-ঘুড়ী, চাই আস্‌বাব্ পোষাক-অট্টালিকা, চাই—মনোরমা বনিতা আজ্ঞাবাহী দাসদাসী, চাই আরও কত কি! নিত্য-নূতন আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষিত ধনেরও বিচিত্রতা। এই মন্ত্রে তাই ধনের বিশেষণ দেখি—'চিত্রং' (বিচিত্রং মণিমুক্তাদিকং)। কেবল কি বৈচিত্র্যে—বিবিধ ধনভোগেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি আছে? তাহা তো নহে! মানুষ চায়—পর্য্যাপ্ত! মন্ত্র তাই ধনের আর এক

বিশেষণ দিলেন—'বিভু', অর্থাৎ ভোগের পর্য্যাপ্ত! তুমি কত ধন চাও? তুমি কত ধন ভোগ করিবে?

* . *

পর্য্যাপ্তই পাইবে! কিন্তু কি প্রহেলিকা! তাহাতেও তো আকাঙ্ক্ষা মিটিল না! ক্ষুধিত হইয়াছ, উদর পুরিয়া আহার কর। মিষ্টান্ন চাও? এত পাইবে—যে উদরে স্থান হইবে না। কোন্ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-সাধন আকাঙ্ক্ষা কর? তোমার দর্শনেন্দ্রিয়—সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চায়? সম্মুখে চাহিয়া দেখ—সৌন্দর্য্যের অনন্তপারাবার এই বিশ্ব, তোমার নয়ন-দুটিকে এখনই সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবে। তোমার শ্রোত্র? সেই বা কতটুকু সুস্বর শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে? পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্ত—সকলই তো তোমার পুরোভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে।

* . *

তবু তো আকাঙ্ক্ষা মিটে না! ভোগ্য সামগ্রী পর্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হইলেও তো আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না! যতই কামনার পূরণ হয়, ততই নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। কামনার তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে? কামনা কখনও মিটে না। আকাঙ্ক্ষার কখনও নিবৃত্তি নাই। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—

> "নিঃস্বো ব্যষ্টিশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাপদং বাঞ্ছতি
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥"

কামনার—তৃষ্ণার কখনই সীমা নাই। যতই প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যবস্তু প্রদত্ত হউক, কামনা কখনই মিটিবে না; নিত্য-নূতন কামনা আসিয়া মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেই তুলিবে।

* . *

তবেই চাই—পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন। মন্ত্র তাই বলিলেন,—'পর্য্যাপ্তের উপরের ধনও তাঁহার আছে।' সে ধনের নাম—'প্রভু'। বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও তো আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না! তখন, সেই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে

হইবে। সে ধন প্রাপ্ত হইলে, তখন আর কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন করিবে না,—তখন সকল কামনার অবসান হইবে, সকল তৃষ্ণায় পরিতৃপ্তি আসিবে। ফলতঃ, প্রার্থী হও—তাঁহার দ্বারে। সকল ধনই তাঁহার নিকটে আছে। তোমার যে ধনের প্রয়োজন হয়, তাঁহার নিকট তাহাই তুমি প্রাপ্ত হইবে। অসার মণিমুক্তাদি-রূপ ধনের প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি তোমায় সার ধন—শ্রেষ্ঠধন—মোক্ষধন অবধি—প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

* * *

সংসারী সাধারণ মানুষ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া—ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া, ধনার্জ্জনে প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন তাহারা যে প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। তবে সে ধন যতই প্রাপ্ত হয়, কামনা ততই বাড়ে; আর, সেই কামনা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে। শেষে এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। তখন, ধন উপভোগ করিবে কি, ধনই শত্রু হয়।

* * *

উপভোগের দুইটা দিক্ আছে। কেবলমাত্র আপন পৌরুষ-প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে সুখৈশ্বর্য্য-সম্ভোগে প্রয়াস পায়,—উপভোগের এই এক দিক্। আর এক দিক্—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া—তাঁহার দান মনে করিয়া—তাঁহারই কর্ম্মে নিয়োগ হওয়া! মন্ত্রে শেষোক্ত-রূপ কর্ম্মাচরণের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বিচিত্র বিবিধ ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর; ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু, যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

* * *

দুই দিকে দুই পথ! এক পথ ডাকিতেছে,—'চলিয়া এস! কাহারও অপেক্ষা করিও না! আপন পৌরুষ-প্রভাবেই তুমি ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত

হইবে।' কিন্তু অন্য পথ কহিতেছে,—'না—না, তেমন কাজ করিও না, অজানা অচেনা পথে একাকী অগ্রসর হইও না, পথে কত বিঘ্ন-বিপত্তি আছে; সুতরাং এক জনের আশ্রয় লইয়া অগ্রসর হও।' এ মন্ত্র সেই আশ্রয় লওয়ার কথাই বলিয়াছে। বলিয়াছে—'তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; আত্ম-পৌরুষ-রূপ অহমিকা পরিত্যাগ কর; তিনি তোমার সকল অভিলাষ পূরণ করিবেন। কর্ম্ম করিয়া যাও; কিন্তু কর্ম্মের কর্ত্তা যে তিনি, এই লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত রও।'

* * *

একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে—এখানে সকাম নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার ঐ সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি নিষ্কাম মার্গে উপনীত হইবে। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট প্রার্থী হও—যিনি সকল ধনের অধিপতি! তোমার ভোগের উপযোগী বিবিধ বিচিত্র ধনই তিনি পর্য্যাপ্ত দিতে পারিবেন; আবার, সে পর্য্যাপ্তের অতীত ধনও তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইবে।' মনে হয়,—এই মন্ত্রে এখানে যেন একটা পর্য্যায়ের ভাব আছে। বিবিধ বিচিত্র চাহিতে চাহিতে, পর্য্যাপ্ত চাহিতে চাহিতে, স্তরে স্তরে, চাওয়ার শেষ-সীমায় উপনীত হইবে। সুতরাং যদি চাহিতে হয়, তাঁহারই নিকট চাও। তোমার সকল কামনাই তিনিই পূরণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন;—পার্থিব অপার্থিব সকল ধনই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন।

---

* মন্ত্রটীর পদাবলী সহজ বোধগম্য হইবে,—এই উদ্দেশে বেদ-মন্ত্রের সংস্কৃত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা হইতে উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্) 'তে' (তব) 'বিভু' (ভোগায় পর্য্যাপ্তং) 'প্রভু' (ততোঽধিকং, ভোগপর্য্যাপ্তাধিকং, অক্ষয়ং) 'রাধঃ' (ধনং) 'অসৎ' (অস্তি) 'ইৎ' (এব); 'চিত্রং' (বিচিত্রং মণিমুক্তাদিকং) 'বরেণ্যং' (শ্রেষ্ঠং, অনিত্যপার্থিবধনাদীনাং অতীতং, নিত্যং ধনমিত্যর্থঃ) 'অর্ব্বাক্' (অস্মদভিমুখং) 'সঙ্কোদয়' (সম্যক্ প্রেরয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! যতস্ত্বমেব নিত্যানিত্যোভয়বিধধনাধিপঃ, অতস্তাদৃগ্ ধনমস্মভ্যং প্রযচ্ছ।'

জ্ঞান-বেদ।

মা নঃ শংসোহঅররুষো ধূর্ত্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্তস্য।

রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! মনুষ্যসুলভ শত্রুস্বরূপ হিংসা ও অভিশাপ আমাদিগকে যেন স্পর্শ করিতে না পারে। তাহাদিগের কবল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ঈর্ষা, হিংসা, অভিশাপ—সংসারকে ঘেরিয়া আছে। সংসারে যত কিছু অশান্তি, তাহাদিগের প্রধান কারণ—ঈর্ষা, হিংসা, অভিশাপ। এ সংসারে মনুষ্যের বোধ হয় কোনও অশান্তি থাকে না—যদি তাঁহারা ঈর্ষার হিংসার অভিশাপের কবল হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন। অপরে আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত, অপরে আমায় অভিশাপ প্রদান (আমার নিন্দা-গ্লানি) করিতেছে,—ইহাও আমার পক্ষে যেরূপ অশান্তির কারণ; আবার অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া, অভিশাপ-বাক্য প্রয়োগ করিয়া, অন্তরে অন্তরে যে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি,—তাহাও কি আমার কম অশান্তি!

আমাদিগের দুঃখ—কিসের জন্য? আমরা যে অহর্নিশ দুঃখ-দাবানলে দগ্ধীভূত হইতেছি, তাহার কারণ কি? কোনও দুঃখ থাকিত কি—যদি ঈর্ষা হিংসা না থাকিত! আমি ভগ্নকুটিরে বাস করি,—ছিন্ন কন্থায় মাঘের দারুণ শীত কাটাইয়া দিতে পারি; তাহাতে আমার কোনও ক্লেশ অনুভূত হইত না—যদি আমার প্রতিবাসীর অট্টালিকা ও দুগ্ধফেণনিভ শয্যা আমার দৃষ্টিকে ঝলসিয়া না দিত! সেই তো আমার দুঃখ! সেই তো আমার

ক্ষোভ! সেই তো আমার ক্লেশ! পক্ষান্তরে, আমার অনশন-ক্লেশ ঘুচাইয়া আমি যখন দু-বেলা দু-মুঠা অন্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হই, অন্যে কেন তখন সে অন্নগ্রাসে হস্তারক হয়?—অন্যের ঈর্ষা-দ্বেষে কেন তাহাতে বিঘ্ন ঘটে? এও এক বিষম দুঃখ! ঈর্ষা-হিংসা দ্বেষ-অভিশাপ—আমার অন্তরের মধ্যে থাকিয়াও আমার ক্লেশ দিতেছে,—আবার আমার পারি-পার্শ্বিক বন্ধুবর্গের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও আমায় দংশন করিয়া ক্লেশ দিতেছে। জ্বালা দুই দিকেই! তাই প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমার হৃদয়কে হিংসা-দ্বেষ-পরিশূন্য কর। সেই আশীবিষ রিপু যেন আমার হৃদয়কে কদাচ স্পর্শ করিতে না পারে। আমি যেন বাক্যে বা ব্যবহারে কখনও কাহারও প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ না করি; পরন্তু আমি যে অবস্থায় আছি, তাহাই যেন আমার সুখের ও আত্মোদ্বোধের আদর্শ হয়।

* *

পরের শ্রীবৃদ্ধিতে মন কেন ব্যথা পায়? যদি ভাবিয়া দেখি, ইহা বুঝিতে পারি না কি,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বৃহত্ত্বের স্পর্দ্ধাও কেহ করিতে পারে না, আবার ক্ষুদ্রত্বের শেষ-সীমায় উপনীত বলিয়াও কাহারও ক্ষোভ করিবার কোনও কারণ থাকে না। উপরের দিকে যতই দৃষ্টিপাত করিবে, কোথাও সীমা-রেখা দেখিতে পাইবে না; নিম্নাভিমুখেও সীমান্ত-রেখা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া আছে, কেহই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তবে আর স্পর্দ্ধাই বা কিসের? তবে আর ক্ষোভই বা কি জন্য? দেখ দেখি—দুই দিকের দুই সীমা-রেখা কে অধিকার করিয়া আছেন? সেও সেই তিনিই—যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই! সেও তো সেই তিনিই—যাঁহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রও আর কেহ নাই। মহত্ত্বের ও ক্ষুদ্রত্বের দুই প্রান্তে 'মহতো মহীয়ান্' এবং 'অণোরণীয়ান্' হইয়া, দেখ দেখি, কে তিনি বিদ্যমান্ রহিয়াছেন? যদি স্বরূপ বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আর ক্ষোভ থাকে না। তাই প্রার্থনা,—হে ব্রহ্মণস্পতি! আমায় স্বরূপ-জ্ঞান দাও। যিনি 'মহতো মহীয়ান্' তিনিই যে আবার 'অণোরণীয়ান্' হইয়া আছেন—এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমি যেন হিংসা-দ্বেষ অভিশাপ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ-শূন্য হইতে পারি।'

জ্ঞান-বেদ।

—:•:—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

কি বিষম দিনই আসিয়াছে এখন! কেহই এখন আর এক পথে চলিতে চাহেন না। পিতা যে পথে চলিয়াছেন, পুত্র এখন তাহার বিপরীত পথে চলিতেছেন। গুরু যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, শিষ্য এখন আর সে পথ মানিতে চাহেন না। ভাই ভাই এখন ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতেছেন। পতি-পত্নীতে পর্য্যন্ত এখন গন্তব্য পথ লইয়া বিরোধ বাধিয়াছে। হিন্দুর মধ্যে পথের ঐক্য নাই! মুসলমানদিগের পথও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে! বৌদ্ধ, জৈন, শিখ—কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা কহিব—কেহই এখন আর আপন পথে চলিতে চাহেন না। বেদ তাই উপদেশ দিতেছেন,—"সংগচ্ছধ্বং।" যদি শ্রেয়ঃ চাও, এক পথের অনুসরণ কর—স্বধর্ম্মের আশ্রয় লও।

* * *

এমনই কাল পড়িয়াছে এখন—এখন আর এক-বাক্য বলিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। পিতা এক বাক্য কহিবে; পুত্র আর এক বাক্য কহিবে। সংসারের সকলেই বিভিন্ন বিপরীত বাক্য-কথনে যেন অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল তাহাই নহে; প্রায় সকলেরই প্রকৃতি হইয়াছে এই যে,—তাহারা আজ এক কথা কহিবে, কাল আর এক কথা কহিবে; তাহারা এখন যে বাক্য বলিবে, একটু পরেই আবার তাহা উল্টাইয়া লইবে! আরে!—সত্য যে এক, সত্য যে অপরিবর্ত্তিত! আজ যাহা সত্য, কালও যে তাহা সত্য, আবার যুগযুগান্ত পরেও যে তাহা সত্য। এ কথা বুঝিয়াও কেহ বুঝিবে না কি? কালের প্রভাবে, মিথ্যার বন্যা বহিয়া, দেশ ডুবাইয়া ভাসাইয়া দিল! তাই এক-বাক্য-কথনে—সত্য কহিতে—কাহারও আর শক্তি নাই! তোমরা এখনও যদি কালস্রোতে ডুবিয়া মরিতে না চাও, এখনও যদি শ্রেয়ঃ আকাঙ্ক্ষা কর ঐ শুন, বেদ বলিতেছেন,—"সংবদধ্বং।" এক-বাক্য বল; পিতা-পিতামহ যে বাক্য বলিয়া আসিয়াছেন, সেই বাক্য বল;—সেই সত্যের, সেই ধর্ম্মের, সেই কর্ম্মের, সেই মন্ত্রের তোমরা উপাসক হও।

* * *

কদাচ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না। হিন্দুকেও বলি, মুসলমানকেও বলি, বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-খৃষ্টান সকলকেই বলি,—কদাচ কেহ স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইও না।

কোনও ধর্ম্মই কখনও কুশিক্ষা দেয় না। কোন ধর্ম্মই কাহাকেও মিথ্যা কহিতে উদ্বুদ্ধ করে না। কোনও ধর্ম্মই কখনও কাহারও প্রাণে ব্যথা দিতে শিক্ষা দেয় না। যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম-নামে অভিহিত হয়, নিশ্চয়ই তাহা সত্যের উপর—প্রেমের উপর—প্রীতির বন্ধনের মধ্যে—প্রতিষ্ঠিত। সেখানে—হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, বিরোধ নাই, বিতণ্ডা নাই, পরপীড়নে স্পৃহা নাই। যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু শোভনীয়, যাহা কিছু লোকহিতকর, সত্য-সরলতা-মহাপ্রাণতা-দয়াদাক্ষিণ্যাদি-গুণগ্রাম—সকলই সেখানে স্তরে স্তরে বিদ্যমান্। দেবগণ দেবভাবসমূহ সেখানেই সমুপস্থিত হন। সেখানেই ঐকমত্য। সেখানেই এক পথ। সেখানেই এক বাক্য কথন। সেখানেই—বেদ বলিতেছেন—"দেবাঃ উপাসতে।" সেখানেই দেবগণ সদাকাল বিদ্যমান রহেন; সেখানেই ভগবানের আবির্ভাব হয়।

* * *

বর্ত্তমান অবস্থায়, এই সঙ্কট সংগ্রামের দিনে, পরস্পরের এই বিষম বৈপরীত্যের মধ্যে, বিভিন্ন-পথে গতিশীল বিপরীত-বাক্যকথনে-অভ্যাস-প্রাপ্ত এই জাতির জীবনে, কি শিক্ষা এখন প্রয়োজন? অনন্তের কোন্ অনন্ত ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া, অতীতের কোন্ দুরধিগম্য প্রান্ত ঝঙ্কৃত করিয়া, মৃত-প্রাণে সঞ্জীবনী-শক্তি সঞ্চারের জন্য, বেদ সেই শিক্ষার অমৃত-ধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বেদ বলিয়াছেন—"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।"

'এক-মন এক-চিত্ত হও, এক মন্ত্র জপ কর, একই মন্ত্রণায় অনুপ্রাণিত হও।' আর,

'সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।'

'এস, শত্রুমিত্র যে যেখানে আছ—এস, একই মন্ত্রে মন্ত্রপূত করিয়া, একই মন্ত্রণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, তোমরা আমরা সকলে, স্বধর্ম্মে—দেবদ্বারে—ভগবৎকার্য্যে, আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করি।' এইরূপ সঙ্কল্পে সঙ্কল্পান্বিত হইয়া, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, এ জাতি যদি আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে পারে; তবেই আবার—আবার সুদিন ফিরিয়া আসিবে—এই হতাশার ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোক আবার উদ্ভাসিত হইবে;—তরুণ অরুণ আবার নবীন কিরণ বিচ্ছুরণ করিবেন।

জ্ঞান-বেদ।

———॥ * ॥———

আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্ দধিষ্ব মে গিরঃ।

ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরং॥

* * *

শ্রুতিতে দেখি, ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ে বলা হয়—"যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্। তদেব ব্রহ্ম…।" শ্রোত্র যাঁহাকে শ্রবণে পায় না, পরন্তু শ্রোত্রের যাঁহা হইতে শ্রোত্রত্ব, তাঁহাকেই এখানে "আশ্রুৎকর্ণ" শ্রুতিসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্য নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ মনে করিতে হইবে। তিনি স্ফুট ও অস্ফুট সকল স্বরই শুনিতে পান। তিনি অন্তরের ও বাহিরের সকল ভাবই বুঝিতে পারেন। গোপনের কুপরামর্শ ও প্রকাশ্যের সদ্ভাবমূলক বাক্য, তাঁহার নিকট কিছুই অগোচর থাকে না। কেন-না, তিনি যে 'আশ্রুৎকর্ণ'।

* * *

মানুষ ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করে, সাধারণতঃ তাহাদের সেই প্রার্থনার তিনটি স্তর দৃষ্ট হয়। শীর্ষোদ্ধৃত মন্ত্র মানুষের সেই চরিত্র-চিত্রের প্রতিচ্ছবি ধারণ করিয়া আছেন। মন্ত্রে লক্ষ্য করুন, ব্যাকুল সাধক প্রথমে কি প্রার্থনা করিতেছেন, আর পরেই বা কি প্রার্থনা করিলেন।

তিনি প্রথমে কহিলেন,—'হে দেব! শুনুন—আমার প্রার্থনা শীঘ্র শুনুন।' পরক্ষণেই কহিলেন,—'আমার এ প্রার্থনা একবার হৃদয়ে স্থান দেন।' শেষে জানাইলেন,—'যদি আমার প্রার্থনা আপনার হৃদয়ে স্থান পায়, সে প্রার্থনা যেন মিত্রভাবে আপনার হৃদয়ে স্থান পায়, আমার প্রার্থনা যেন আপনার প্রিয়তর সামগ্রী মধ্যে গণ্য হয়।'

* * *

দুঃখপারাবারে নিমজ্জমান্ থাকিয়া, যন্ত্রণায় অস্থির বিচঞ্চল হইয়া, মানুষ প্রথমে ভগবানকে এক ভাবে ডাকে। প্রার্থনা শুনিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, তিনি যেন দুঃখ দূর করেন,—প্রথমেই এই ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু, শুনিয়াও যখন সে প্রার্থনা ভগবান্ শুনিতে পান না, কর্ম্মফল-রূপ যন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী ফলভোগের প্রতি তিনি যখন উদাসীন-ভাব প্রকাশ করেন, মানুষ তখন ভগবানকে আর এক ভাবে ডাকে; ডাকিয়া বলে,—'দয়াময়, আর যে সহিতে পারি না! আমার প্রার্থনা আপনার হৃদয়ে একবার স্থান দেন।' কিন্তু সে আহ্বানও যখন সুফলপ্রসূ হয় না, তখন প্রার্থনা করে,—'হে ভগবন্, এই করুন, আমার বাক্য বা প্রার্থনা যেন আপনার প্রীতিপদ হয়।' মানুষের প্রার্থনার এই তিন স্তর।

* * *

তিনি 'আশ্রুৎকর্ণ', সমস্তই শুনিতে পাইতেছেন;—এ বিশ্বাস যখন আসে; তখন বুঝায়, সে প্রার্থনা তিনি শুনিতে পাইতেছেন, কিন্তু পূরণ করিতেছেন না। এইরূপ ভাব মনে উদয় হওয়ার পর, শুনিয়াও কেন শুনিতেছেন না—তাহার কারণ অনুসন্ধানে চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার ফলে, মানুষ বুঝিতে পারে, তাহার প্রার্থনা—তাঁহার শুনিবার উপযোগী প্রার্থনা হয় নাই। তখনই বুঝিবার চেষ্টা হয়—কি হইলে বা কি প্রার্থনা করিলে তাঁহার শ্রবণযোগ্য প্রার্থনা হয়। তাহাতেই জ্ঞান আসে,—'তাঁহার প্রীতিজনক প্রার্থনা যাহা, তাহাই সঙ্গত ও তাঁহার শ্রবণীয়।'

——:•:——

জ্ঞান-বেদ।

বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং।
বৃষন্তমস্য হূমহ ঊতিং সহস্রসাতমাং॥

• • •

হে ভগবন্। 'ত্বা' (ত্বাং) 'বৃষন্তং' (কামানামতিশয়েন বর্ষিতারং, শ্রেষ্ঠকামনা-পূরকং) 'বাজেষু' (অন্তর্বহিঃসংগ্রামেষু)· 'হবনশ্রুতং' (অস্মদীয়স্যাহ্বানস্য শ্রোতারং, অরিদমনকার্য্যে সহায়ং ইতি ভাবঃ) 'বিদ্মা হি' (জানীম এব); অতঃ 'বৃষন্তমস্য' (ইষ্টসাধকস্য) তব 'সহস্রসাতমাং' (অশেষসুখসাধিকাং) 'ঊতিং' (রক্ষাং—উদ্দিশ্য ইতি যাবৎ) 'হূমহে' (আহ্বয়ামঃ—বয়মিতি শেষঃ)। ভগবন্তং শ্রেষ্ঠকামনাপূরকং অরিদমন-সহায়ং জ্ঞাত্বা অশেষসুখসাধিকাং রক্ষাং প্রার্থয়াম ইতি ভাবঃ।

• • •

ভগবান্ শ্রেষ্ঠ কামনা পূরণ করেন। শত্রুর সহিত সংগ্রামের সময় তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তিনি নিশ্চয়ই সে আহ্বান সর্ব্বদা শুনিতে পান।

• • •

কামনার অন্ত নাই। কিন্তু তিনি কামদাতৃশ্রেষ্ঠ অথবা শ্রেষ্ঠ কামনার পূরণকর্ত্তা। যে কামনা অন্য কাহারও পূরণ করিবার সামর্থ্য নাই অথবা যে কামনা শ্রেষ্ঠ কামনা, সে কামনা তাঁহারই দ্বারা পরিপূরিত হয়।

• • •

কামনার শ্রেষ্ঠ কোন্ কামনা, আর অন্যে পূরণ করিতে পারে না—কোন্ কামনা, তাহা বুঝিবার পক্ষে চেষ্টা পাইলেই স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ কামনা—মোক্ষ বা মুক্তি। সে কামনা পূরণ করিতে পারেন—একমাত্র ভগবান। ভগবৎসম্বন্ধে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

• • •

সংগ্রাম অন্তরে ও বাহিরে দুই দিকে দুই ভাবে চলিয়াছে। শত্রু—নানা-প্রকারের। যে কোনও শত্রুর সহিত যে ভাবেই যুদ্ধ আরব্ধ হউক, ভগবানে শরণাপন্ন হইলে, তিনি শত্রু-বিমর্দ্দনে সহায় হন। এ ক্ষেত্রে আমরা মনুষ্য শত্রুর সহিত মনুষ্যের সংগ্রাম অপেক্ষা অন্তঃশত্রুর সহিত আমাদের যে নিত্য সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহারই বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। সেখানে তাঁহার সহায়তা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয়।

• • •

মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাধিলে উভয় পক্ষেই তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারে। এরূপ স্থলে তিনি কোন্ পক্ষে সহায়তা করিবেন? বলিতে পার,—'ন্যায়-পক্ষ ও অন্যায়-পক্ষ দুই পক্ষ আছে; তিনি সেই বুঝিয়া ন্যায়-পক্ষ অবলম্বন করিবেন।' কিন্তু তাহাতে আহ্বানের সার্থকতা কোথায় রহিল? পরন্তু দুই পক্ষই ন্যায়বান ধর্ম্মপরায়ণ হইতেও তো পারেন! সে ক্ষেত্রেই বা কি সিদ্ধান্ত করিবেন—বুঝিব?

• • •

এরূপভাবে বিচারে দয়াময় ভগবানের কার্য্যেও পক্ষপাতিত্ব-দোষ আরোপ করা যাইতে পারে। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত করি, এ যুদ্ধ—সে যুদ্ধ নহে; যে নিত্যসংগ্রাম অনন্তকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছে, মন্ত্রে সেই সংগ্রামেরই ইঙ্গিত রহিয়াছে। সে সংগ্রামে ভগবানের সাহায্য-প্রার্থী এক-পক্ষ মাত্র হইতে পারে; আর সে সংগ্রামে সহায়তার প্রার্থনা করিলে, ভগবানের করুণার ধারা স্বতঃই প্রার্থীর সাহায্যার্থ প্রবাহিত হয়।

• • •

বুঝিয়া দেখুন—সে সংগ্রাম কোন্ সংগ্রাম? তোমার আমার সকলেরই হৃদয়ের মধ্যে সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, মন্ত্রে সেই দ্বন্দ্বেরই আভাস আছে। তুমি সন্মার্গগামী হইতে চাহিবে; অসদ্বৃত্তি তোমায় বাধা দিতে আসিবে; ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। মন্ত্রের উপদেশ,—'সে সময় তুমি ভগবানের শরণ লইবে; সে দ্বন্দ্বে তুমি ভগবানকে আহ্বান করিলে, তিনি সুনিশ্চয় তোমার সহায় হইবেন। তুমি সুপথ দেখিতে পাইবে।'

—— • ——

জ্ঞান-বেদ।

—*—

আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।

নব্যমায়ুঃ প্রসূতির কৃধী সহস্রসামৃষিং ॥

* * *

ধন-জন-ঐশ্বর্য্য পুত্র-বিত্ত-শৌর্য্য-বীর্য্য সকল-রূপ প্রার্থনার পর, সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! হে অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্রদেব! আমায় সৎকর্ম্মশীল প্রশংসনীয় আয়ুঃ দান করুন,—আর আমাকে বিজিতেন্দ্রিয় ঋষি করিয়া তুলুন।' মর্ম্মার্থ এই যে,—'আমি আয়ুঃ চাহি—ভোগের জন্য নহে; আমি আয়ুঃ চাহি—বাঁচিবার সুখের জন্য নহে; আমি আয়ুঃ চাহি এমন,—সে আয়ুঃ যেন নব্য অভিনব সৎকর্ম্মশীল প্রশংসনীয় হয়; আমি আয়ুঃ চাহি এমন,—সে আয়ুঃ যেন আমায় ঋষিত্বে লইয়া যায়। যদি আমায় আয়ুঃ দেও, যদি আমায় বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজন বোধ কর, আমার জীবন যেন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকে, আমি যেন সর্ব্বপ্রকারে ঋষি হইতে পারি, আমি যেন বিজিতেন্দ্রিয় হই, আমি যেন অতীন্দ্রিয় তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি।' এই তো মানুষের মত প্রার্থনা—এই তো সাধকের মত সাধনা! কেমন ভাবে, কিরূপ প্রার্থনার মধ্য দিয়া, সাধনার এই স্তরে সাধক উপনীত হন, পর্য্যায়ক্রমে তাহা লক্ষ্য করুন,—অন্তরে অন্তরে অনুধাবন করিয়া দেখুন।

—*—

জ্ঞান-বেদ।

—:*:—

পরি ত্বা গির্ব্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।

বৃদ্ধায়ুমনুবৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ॥

সকল কর্ম্মে প্রযুজ্যমান আমার স্তুতি যেন তোমাকে প্রাপ্ত হয়; আমি যেন এমন অপকর্ম্ম কিছু না করি, যাহার জন্য আমার স্তুতি তোমার নিকট উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়; আমি যেন তেমন কর্ম্ম করিতে পারি, যাহাতে নিঃসঙ্কোচে আমার স্তুতি তোমার নিকট পৌঁছিয়া যায়। পরন্তু, 'তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া আমার সন্তোষ হউক, তোমার সেবায় তোমারই উদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম্মে আমার প্রীতি আসুক।' এ সকল ভাবের কি তুলনা আছে? এ ভাবের এক প্রস্ফুট চিত্র—শ্রীমতী শ্রীরাধা; কিন্তু তিনি লোকাতীত—এখন আর এ লোকের নহেন—গোলোকের। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি হরিপরায়ণগণ—অধুনা উপাখ্যানের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ সম্মুখে ধরি? কে আর কহিবে এখন,—

'তোমারি সুখেতে আমারি সুখ,
তোমারি সেবায় প্রীতি পাই।
তোমারি হাসি অমিয় রাশি
হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই।'

সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ;—তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে—এই মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন;—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে?

জ্ঞান-বেদ।

—— ✽ * ✽ ——

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে।
যশসং বীরবত্তমং॥

* * *

সংসার কামনা-সাগরে নিমজ্জমান্। মানুষ কামনার দাস। সে চায়—রূপ, সে চায়—ঐশ্বর্য্য, সে চায়—ধন-পুত্র, সে চায়—যশোগৌরব। তার কামনার অন্ত নাই! এই মন্ত্র—মানুষের সেই কামনার তৃপ্তিসাধন-কল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ যাহা চাহে, চিরকাল যাহা চাহিয়া আসিতেছে, আজীবন যাহা চাহিবে, যে চাওয়া অফুরন্ত, যে চাওয়ার কখনও শেষ নাই,—এই মন্ত্রে সেই চাওয়ারই অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে!

* * *

অগ্নিদেবের উপাসনা কেন করিব? উত্তরে বলা হইতেছে,—তাঁহার অনুগ্রহে যশঃ বৃদ্ধি হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে কেন ব্রতী হইব? বলা হইতেছে,—অগ্নিদেবের উপাসনা-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদিসহ ধনরত্ন লাভ করা যায়। মানুষ!—তুমি ইহার অধিক আর কি চাহিতে পার? তোমার আকাঙ্ক্ষিত, তোমার কাম্য—সকলই তো তিনি প্রদান করিবেন! তবে আর তোমার কিসের অভাব? তবে আর কেন তুমি বিভ্রান্ত হইয়া ছুটিতেছ? ভগবানকে উপাসনা কর; তোমার সকল কামনা পূর্ণ হইবে! ভগবানের উপাসনার প্রতি মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে ইহার অধিক আকর্ষক বাণী আর কি সম্ভবপর হয়?

* * *

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—বৈদিক কর্ম্ম—যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বিবিধ উদ্দেশ্যমূলক। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে যজ্ঞ দুই প্রকার। যে কর্ম্মফলে ঐহিক সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম কহে। আর যে কর্ম্মফলে মুক্তি অধিগত হয়, তাহাকে নিবৃত্ত-কর্ম্ম বলে। কিবা ইহলোক সম্বন্ধে, কিবা পরলোক সম্বন্ধে কিবা যশঃ ও ঐশ্বর্য্য লাভের উদ্দেশ্যে, কিবা স্বর্গাপবর্গ লাভের আকাঙ্ক্ষায়,—যে কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই প্রবৃত্ত কর্ম্ম কহে। আর জ্ঞান-পূর্ব্বক যে নিষ্কাম কর্ম্ম—যে কর্ম্মে কোনও আকাঙ্ক্ষার সংশ্রব নাই—যে কর্ম্ম অনাবিল এবং বিষয়-সম্বন্ধ-শূন্য, তাহাকেই নিবৃত্ত কর্ম্ম কহে। প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠানে ইন্দ্রাদি দেবগণের আসন লাভ করাও অসম্ভব নহে। যে কামনা করিয়া মানুষ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ সাধনার ফলে তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসের ফলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করিয়া মানুষ সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। সেই অবস্থাই নিঃশ্রেয়স্ মোক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। সেই অবস্থাই আত্মায় আত্ম-সম্মিলন। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত কর্ম্মে ইহাই পার্থক্য। মন্ত্রে সেই প্রবৃত্ত কর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

* * *

কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। প্রবৃত্ত কর্ম্মই নিবৃত্ত কর্ম্মে লইয়া যাইবে। তাই প্রথম প্রয়োজন—শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্ত কর্ম্ম। শাস্ত্রানুসৃত প্রবৃত্ত কর্ম্মের ফলে অনুষ্ঠান-জনিত কর্ম্মপ্রবাহে ক্রমশঃ নিবৃত্ত-কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ যে কর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হইলে, এই মন্ত্রের নিগূঢ়ার্থ বোধগম্য হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" কোন্‌টী কর্ম্ম, কোন্‌টী অকর্ম্ম,—এ বিষয় বুঝিতে, সত্যই বিবেকী জনগণও মোহাচ্ছন্ন হন। অনেক সময় বিভ্রমবশতঃ আমরা কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। বাষ্পীয় যানে পরিভ্রমণকালে পার্শ্বস্থিত তরুরাজি সচল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। দূরস্থিত চন্দ্রদেব অচল বলিয়া প্রতীত হন। একে অকর্ম্মে কর্ম্ম, অপরে কর্ম্মে অকর্ম্ম। এই তত্ত্ব বিশদীকৃত করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ কর্ম্মকে

তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন একই কর্ম্ম তদনুসারে, কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ত্রিবিধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—কর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, অকর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, আর বিকর্ম্মকে বুঝিতে হইবে। কর্ম্ম কি? কর্ম্ম বলে তাহাকেই, যাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত। শাস্ত্র যাহা আদেশ করিয়াছেন, সেই আদেশ পালন করিবার জন্য যাহা করিবে, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মই তোমার শুভফলপ্রদ। যে কর্ম্ম করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহারই নাম—বিকর্ম্ম। সে কর্ম্মে কদাচ শ্রেয়ঃ নাই। কোনও কর্ম্ম না করা অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন—অকর্ম্ম মধ্য গণ্য। এই যে অকর্ম্ম—এই যে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। এই নিষ্কাম কর্ম্মেই মোক্ষ অধিগত হয়। সকাম কর্ম্মই নিষ্কামকর্ম্মের পথ-প্রদর্শক।

• • •

অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মশূন্যতা নৈষ্কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। যে বিবেকী জন, কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম—এই তিনের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া অকর্ম্মে (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপারে নির্লিপ্ত) থাকিতে পারেন, তিনিই ধন্য—তাঁহারই কর্ম্মানুষ্ঠান সার্থক। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চাপি বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

অকর্ম্মের মধ্যেও যিনি কর্ম্ম দেখিতে পান, এবং কর্ম্মের মধ্যেও যিনি অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) উপলব্ধি করেন, তাঁহারই সকল কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) এবং অকর্ম্মের (নৈষ্কর্ম্ম্যের) মধ্যে কর্ম্ম কি প্রকারে আসিতে পারে? আর, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম কি করিয়াই বা বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়? অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাবের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধ হয়। আমরা যখন মনে করি,—'আমরা চুপ করিয়া বসিয়া আছি; আমরা কোনও কর্ম্ম করিব না; তূষ্ণীম্ভাব-অবলম্বনে আমরা দিন কাটাইব, তখন কি কর্ম্মাভাব উপস্থিত হয়? তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন—চুপ করিয়া থাকিবার চেষ্টা—সেও

কি কর্ম্ম নয়? 'আমি নিষ্ক্রিয় বসিয়া আছি; কর্ম্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না;—এবম্বিধ অনুভাবনা কি কর্ম্ম নহে? অহঙ্কারাভি- ভূত মানুষই মনে করে,—'আমি নিষ্ক্রিয় আছি।' ফলতঃ, অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্মের ক্রিয়া সমভাবে চলিয়াছে। এ সকল অহঙ্কারেরই লীলা খেলা। অহঙ্কার—অকর্ম্মকেও বিকর্ম্মে পরিণত করে। সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ কর্ম্মত্যাগ করিয়া জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছেন। দস্যু- তাড়িত প্রাণভয়-ভীত কোনও বিপন্ন জন তাঁহার শরণাপন্ন হইল; আশ্রয় ভিক্ষা চাহিল; প্রার্থনা জানাইল,—'আমায় দস্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করুন।' কিন্তু সাধুপুরুষ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন; তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মনে মনে কহিলেন,—'কর্ম্মত্যাগী আমি; আমি কেন উহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইব?' তাঁহার সেই অনুভাবনার ফলে, তাঁহার সেই অহঙ্কারের পরিণামে, আশ্রয়প্রার্থী জন দস্যুহস্তে নিহত হইল। আর তাহার ফলে, সাধুর তূষ্ণীম্ভাব-রূপ অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পরিণত হইল। তপঃপরায়ণ সাধু কর্ম্মফলে নিরয়গামী হইলেন; তাঁহার কর্ম্ম অকর্ম্মের ফল প্রদান করিল। এবম্প্রকারে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পরিণত হয়, এবং কর্ম্মের মধ্যেও অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্ম সংশ্রব সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে ভ্রান্ত- বুদ্ধি মানুষের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু অন্ধবিশ্বাসী হইয়া অভ্রান্ত শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণ করাও বরং সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

* * *

শাস্ত্রানুশাসিত কর্ম্ম, প্রবৃত্তই হউক, আর নিবৃত্তই হউক, উভয়েই শুভ ফল প্রদান করে। কাম্য কর্ম্মের নিন্দা শতকণ্ঠে বিঘোষিত হউক; তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। পরন্তু কাম্যকর্ম্ম যদি শাস্ত্রানুসারী হয়, তাহার শুভফল কেহই রোধ করিতে পারে না। সেইরূপ, কর্ম্মের ফলে কর্ম্মাতীত মোক্ষ পর্য্যন্ত অধিগত হইতে পারে। ধনরত্নযশঃ আদি ঐশ্বর্য্যের কামনায় শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে আপনিই সে কামনা ভস্মীভূত হয়। তখন প্রবৃত্ত কর্ম্মের মধ্যেই নিবৃত্ত কর্ম্ম অধ্যুষিত হইয়া থাকে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—অগ্নিদেবের অনুগ্রহে প্রতিদিন যশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ কথা ধ্রুব সত্য। যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে 'ধার্ম্মিক'

বলিয়া যে লৌকিক যশঃ, তাহা তো আছেই। যজ্ঞাদি পূজাকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এ সংসারে কে না যশস্বী হইয়া থাকেন? অগ্নিদেবের অনুগ্রহে যে যশঃ লাভ হয়, সে যশের তুলনা নাই। পরীক্ষার অনল উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, যশঃ কোথায় আছে? অনলে দগ্ধীভূত হইয়াই কাঞ্চনের কান্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। মা জানকী—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী—লোকললামভূতা সীতাদেবী—অগ্নি পরীক্ষার প্রভাবেই প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন। হরিপরায়ণ প্রহ্লাদ ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়াই আপন পুণ্যস্মৃতি অক্ষয় রাখিয়া গিয়াছেন। সত্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক নৃপতিবৃন্দ অগ্নি-পরীক্ষার কি কঠোর দহনই সহ্য করিয়াছিলেন! অতীত-স্মৃতি ইতিহাস সে সকল কাহিনী চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এ সংসারে অগ্নি পরীক্ষা ভিন্ন যশঃ কোথাও নাই। প্রকৃত যশোভাজন হইতে হইলে, অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়াই সে যশঃ লাভ করিতে হইবে। যশের ফল যে কীর্ত্তি, তাহা সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানেরই অনুসারী হইয়া আছে। ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ জনের যশঃখ্যাতি কোথায় নাই? মন্ত্রে আছে,—"বীরবত্তমং রয়িং অশ্নবৎ।" ভাষ্যকারগণ অর্থ করেন,—'বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদি সহ ধনরত্ন লাভ করা যায়।' এই অর্থ—সংসারী অবোধজনকে ধর্ম্মানুসারী করিবার উদ্দেশ্য মাত্র। নচেৎ, এই অংশে বলা হইতেছে,—সে সেই শ্রেষ্ঠ ধন—যে ধনের আর তুলনা নাই; সে সেই নিঃশ্রেয়স্ মোক্ষ ধন—যাহার অধিক আর কামনার বিষয় নাই; অগ্নিদেবের আরাধনায়—জ্ঞানদেবতার বা জ্ঞানাধার ভগবানের শরণাপন্ন হওয়ায়, সেই যোগিধ্যেয় পরম ধন অমূল্যরতন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদিরূপ ধনরত্ন সংসারীর কাম্য হইতে পারে; কিন্তু সে ধনের আকাঙ্ক্ষায় ভগবানের অনুসরণ করিতে করিতে যখন সেই নিত্যসত্য সনাতন পরমধনের অধিকারী হওয়া যায়, তখনই সকল আকাঙ্ক্ষার—সকল কামনার অবসান হয়। এ মন্ত্রে, কর্ম্মের মধ্য দিয়া, সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের দিকে অগ্রসর করিবার পন্থাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

জ্ঞান-বেদ।

—— ‡•‡ ——

তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো।
ধনানামিন্দ্র সাতয়ে॥

• • •

কিবা লৌকিক জগতে, কিবা আধ্যাত্মিক জগতে, সর্ব্বদা সর্ব্বকালে বিষম সংগ্রাম চলিয়াছে। সে সংগ্রামে কেহ জয়লাভ করিতেছে, কেহ বিধ্বস্ত হইয়া পতনের অতলতলে নিমজ্জিত হইতেছে। কালরূপী রিপুগণ সদাই প্রবল হইয়া আছে; কামক্রোধাদি সদাই মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। তাই জ্ঞানালোক-প্রাপ্তির কামনায়, সৎস্বরূপের করুণা-আকর্ষণের প্রয়াস। "বাজেষু বাজিনং"—তিনি অদ্বিতীয় যোদ্ধ-পুরুষ—তিনি অশেষ বলবন্ত। তিনি যদি হৃদয়ে বলসঞ্চার করেন, তাহা হইলে ভাবনা কি? রিপু-দস্যু আপনিই পরাভূত হইবে; —জ্ঞান-সূর্য্যের বিমল আলোকে হৃদয়ের অন্ধকার আপনিই বিদূরিত হইবে।

• • •

সত্যজ্ঞানের অভাবই—অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই সকল দুঃখের আকর। অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে, সত্যের নির্ম্মল-জ্যোতিঃ হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে, শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে

হইলে—রিপু-দস্যুর নির্ম্মূল-সাধনে সমুৎসুক থাকিলে,—সত্যের অনুসন্ধান প্রথম প্রয়োজন। সত্যের অনুসন্ধান—ধর্ম্মের অনুসন্ধান—সৎস্বরূপের অনুস্মরণ। অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝা যায়,—একমাত্র সত্যের দ্বারা লোক-সমূহ ধৃত বা সংরক্ষিত হইয়া আছে। যাঁহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, তিনিই ধৃত বা সংরক্ষিত হন; অর্থাৎ—তিনিই মোক্ষ-লাভের অধিকারী হইতে পারেন। শাস্ত্রোপদেশ হইতে বুঝা যায়,—একমাত্র সত্যের আশ্রয়েই সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়;—একমাত্র সত্যের সাহায্যেই শত্রু-সংহারের উপযোগী বলে বলীয়ান হওয়া সম্ভবপর।

* * *

সত্য-বল—শ্রেষ্ঠবল। সত্যের অনুসরণেই যদি সাধনার ধন লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে সত্যের স্বরূপ কি বুঝিতে হইবে। যাহা সত্য, যেমন করিয়াই দেখ, তাহা কখনই অসত্য বা অসৎ হইতে পারে না। সত্য—জ্ঞানেরই নামান্তর। সত্যকে চিনিবার পক্ষে—জ্ঞানকে বুঝিবার পক্ষে—সত্যই প্রধান সহায়—জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। সত্যের সাহায্যেই সত্যকে পাইতে পারি; জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞান-লাভ হইতে পারে,—আলোক-সাহায্যেই আলোক-লাভ সম্ভবপর। আলোক-লাভ না হইলে—জ্ঞান-লাভ না হইলে—সত্যের অনুসরণ না করিলে,—কখনই সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

* * *

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অজ্ঞান জন ভ্রমবশে সত্য-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। অজ্ঞানান্ধ যে মূঢ় ব্যক্তি, সে এই সংসারকে সুদূর-প্রবাহিত বলিয়া মনে করে; তজ্জন্যই তাহাকে মধ্যে মধ্যে অলীক দুঃসহ দুঃখ ও মিথ্যা-কল্পিত সুখ অনুভব করিতে হয়। যেমন পরিষ্কৃত ভূমি হইতে দুর্ব্বাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুখস্পর্শ বৃক্ষ হইতে তীক্ষ্ণধার দুঃখস্পর্শ কণ্টকও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অজ্ঞানীর অন্তঃকরণে শত দিক হইতে শত শত বাসনার উদয় হইয়া থাকে। যে অজ্ঞ—যাহার চৈতন্য নাই, তাহার অন্তঃকরণও চৈতন্যশূন্য জড়—পরিদৃশ্যমান্ মৃত্তিকার ন্যায় অসার। মাটিতে সমস্তই জন্মে। অচৈতন্য পৃথিবীর বক্ষে জীবন-

বিনাশক বিষলতাও জন্মিয়া থাকে ;—সেও ফুলফলে নব নব পল্লবে কত শোভা ধারণ করে। মূর্খে তাহা দেখিয়া বিমোহিত হয়। মূর্খের হৃদয় মৃত্তিকার ন্যায় অসার। তাই তাহাতে কোমলপল্লবা বিষলতারূপিণী অঙ্গনা বিলাসময়ী হইয়া শোভা পায়। সে লতায় অঙ্গনার চঞ্চল নয়নই চঞ্চল ভ্রমরী। সে ভ্রমরীর মোহকর বিলাসে তাহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল। তাহাদের স্ফুরিত অধরই নবপল্লব। মূর্খে উহা দেখে, আর মোহিত হইয়া যায়। জলময় সমুদ্র ভীষণ তরঙ্গে নিয়তই অশান্ত। তাহার দুঃখমূর্ত্তি বাড়বানল-রূপে তাহাকে কতই দুঃখ দিয়া থাকে। সংসারে যে অজ্ঞ, তাহারও সেই দুর্গতি। যে জগৎ জ্ঞানীর চক্ষে অতি কোমল—অতি সুন্দর এবং যাহা গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প জলময় অতি ক্ষুদ্র এবং অনায়াসে পার হইবার যোগ্য; সেই জগৎই অজ্ঞের পক্ষে অগাধ জলময় এবং একেবারে অপার।" জ্ঞানলাভে অজ্ঞতা-দূর ভিন্ন, সে জলধি হইতে উদ্ধারের উপায় নাই!

* * *

মন্ত্রে যে সংগ্রামের বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং যে সংগ্রামে দেবতার নিকট সাহায্য-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; সংসারে অহর্নিশ সেই সংগ্রাম চলিয়াছে। পাপ-প্রলোভন নিয়ত মানুষকে আক্রমণ করিতেছে; অজ্ঞানতা-নিবন্ধন মানুষ সে আক্রমণে বাধা দিতে পারিতেছে না। সুতরাং পুনঃপুনঃ পর্য্যুদস্ত হইতেছে।

* * *

এ অবস্থায়, প্রথম প্রয়োজন—পাপ-পুণ্যের, সত্যাসত্যের বা কর্ম্মাকর্ম্মের জ্ঞান-লাভ। সৎগুরুর আশ্রয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সৎসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা—এতদ্দ্বারাই সেই জ্ঞান লাভ হয়। যদি শ্রেয়ঃ চাও, একে একে এই সকলের অনুবর্ত্তী হও।

—— • ——

জ্ঞান-বেদ

——ঃ✤ * ✤ঃ——

রতাং সূনৃতা উৎপুরন্ধীরুদগ্নয়ঃ

শুশুচানাসো অস্থুঃ।

স্পার্হা বসূনি তমসাপগূল্হা বিষ্কৃণ্বন্ত্যুষসো বিভাতীঃ

* • *

অনন্ত-বিসারী অজ্ঞান-পারাবার। চিত্তবৃত্তি বিপথে পরিচালিত। কিরূপে উদ্ধার পাইব?—কিরূপে সে তিমির-জাল ভেদ করিয়া ঊষার আলোক লাভ করিব? কোন্ পথে যাইব? কে সে পথের সন্ধান বলিয়া দিবে? কেমন করিয়া অগ্রসর হইব।

* • *

সারাজীবন মোহপঙ্কে নিমজ্জিত রহিলাম। সারাজীবন অজ্ঞান-তিমিরে ডুবিয়া মরিলাম। অন্ধকার—চারিদিকে অন্ধকার। সে মোহঘোর কি কাটিবে না?—সে অন্ধকারে কি আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইবে না?—সে পথের কি সন্ধান মিলিবে না?—এ জীবনে কি উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই?

* • *

মন চঞ্চল। চিত্তবৃত্তি উন্মার্গগামী। কিরূপে উষার আলোক লাভ করিব? কিরূপে অন্ধকারে আলোক-রশ্মি ফুটিয়া উঠিবে? সৎপথ—সৎপ্রসঙ্গ, সে তো বহুদিনই পরিত্যক্ত হইয়াছে! নিত্যসহচর যাহারা, তাহারা তো নিরন্তর বিপথে পরিচালিত করিতেই উন্মুখ হইয়া আছে! সে প্রভাব খর্ব্ব করিবার সামর্থ্য কোথায়? সে প্রভাব খর্ব্ব করিয়া কিরূপেই পুনঃ উদ্ধার পাইব? চঞ্চল মনকে—উন্মার্গগামী চিত্তবৃত্তি-সমূহকে—সংযত করিয়া, কে আমার পরিত্রাণ সাধন করিবে?

* * *

অজ্ঞানান্ধ জীব মোহবশে সুখ-শান্তির অন্বেষণে বিভ্রান্ত হয়। সুখ-শান্তি-লাভের আশায় সে বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত সুখ—প্রকৃত শান্তি কোথায় মিলিবে? যাহাকে সুখের নিদানভূত বলিয়া মনে হয়, পরিণামে তাহাই বিষোদ্গিরণ করে। ফলে, আপাতঃমধুর পরিণাম-বিরস এবং আপাতঃবিরস পরিণাম-মধুর সামগ্রীর আকর্ষণে বিকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া সে বিভ্রান্ত হয়। বিভ্রান্ত হইয়া, তাই সে হতাশের অন্তর্দ্দাহে জর্জ্জরিত হইয়া মরে।

* * *

এ মন্ত্র সেই হতাশায় সান্ত্বনা-দান করিতেছে। মন্ত্র তাই প্রথমে সত্য-পরায়ণ হইয়া সৎপথে গমনের উপদেশ দিতেছে। তার পর, সৎপরায়ণ হইয়া চৈতন্য-সম্পাদক প্রজ্ঞান-জনক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের উপদেশ দিতেছে। সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া সদ্‌বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রজ্ঞা-রূপিণী উষাদেবী হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া অন্ধকারে আলোকরশ্মি বিকীরণ করেন;—অজ্ঞানান্ধকার-প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ-ফল প্রদান করেন। তখনই সাধনার ধন—পরমধন পাইবার অধিকার জন্মে।

* * *

তবেই বুঝা যায়,—সদ্‌বস্তু প্রাপ্তির জন্য সত্যপরায়ণ ও সৎপথাবলম্বী হইতে হইবে। তমোভাবে সে সামগ্রী লাভ হয় না। তিনি সৎ; সৎসামগ্রীতেই তিনি সমাবিষ্ট। সদ্বস্তুর সমাবেশ ভিন্ন, অন্তরে তাঁহার অধিষ্ঠান সম্ভবে কি? তাই সৎস্বরূপকে পাইতে হইলে, সৎপথের পথিক হইতে হইবে, সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে, অন্তরে শুদ্ধবুদ্ধির সমাবেশ

করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান লাভে সমর্থ হওয়া যায়; আর, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই মুক্তি বা মোক্ষলাভ হয়।

* * *

তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—'মন, তুমি সৎপথাবলম্বী ও সত্যপরায়ণ হও। চিরদিন অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন রহিয়া কেবল পাপপঙ্কেই মগ্ন রহিলে; আর সময় নাই। একবার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত কর। সে জ্ঞাননেত্র লাভ করিতে হইলে, প্রথমে তোমাকে সত্যপরায়ণ ও সৎপথাবলম্বী হইতে হইবে। নচেৎ, তোমার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। যদি পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, সত্যের অনুসরণ কর। সত্যের অনুসরণে, তোমার অন্তরে চৈতন্যদায়িনী উষার নবীন আলোক বিকীর্ণ হইবে; আর সেই আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।'

* *

কিন্তু সেই আলোক-সাহায্য লাভ করা বড়ই কঠিন। এ সংসার এমনই বিষম স্থান, মোহ-মরীচিকা এখানে এমনই আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে যে, পথ-নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেক সময় আলেয়ার আলোর ন্যায় কুপ্রবৃত্তিগুলি পথ দেখাইয়া বিভ্রান্ত করে। তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ-লাভ বড়ই আয়াস-সাধ্য। সত্যের আশ্রয় অবলম্বন ভিন্ন, সে পক্ষে আর উপায়ান্তর নাই। শাস্ত্র তাই সাবধান করিয়া বলিতেছেন,—'উষার আলোক লক্ষ্য কর; সৎপথের পথিক হও।'

——•——

জ্ঞান-বেদ।

—:***:—

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।

আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য

আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

* * *

এই দৃশ্যমান চরাচরের মধ্যে যে সকল তেজ পরিদৃষ্ট হইতেছে, (যেমন, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতির), এ সকল তেজের মূলে এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড তেজ বিদ্যমান আছে। তেজের কেন্দ্র একটী। সেই কেন্দ্রীভূত তেজ হইতেই পরিব্যক্ত হইয়া এই দৃশ্যমান্ তেজঃসকল বিবিধভাবে জীবজগতে পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন এক জল, বহু প্রণালীর মধ্যে নানা বর্ণে বিচিত্র করিয়া লওয়া যাইতে পারে; যেমন এক অগ্নিজ্বালা, বিবিধ আধারের মধ্য দিয়া বিভিন্ন আকারে পরিদৃষ্ট হইতে পারে; সেইরূপ এক পরমাত্মজ্যোতিঃ বহুভাবে জগতের উপর আপন জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া আছেন।

* * *

ইহাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই বলা যাইতে পারে। খণ্ড খণ্ড তেজকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত তেজকে সমষ্টি বলে। তাহাও কিন্তু পারমার্থিক জগতের নহে; ব্যবহারিক জগতেরই জন্য। পারমার্থিক জগতে—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতি"—বহুত্বের অবভাস নাই। যাহা কিছু বহুত্ব, তাহা ব্যবহারিক জগতের। সুতরাং এই ব্যবহারিক জগতের যাহা কিছু দৃশ্যমান্ তেজ বহুরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে, পারমার্থিক জগতে তাহা কিন্তু এক—অখণ্ড, অসীম ও নিত্য। তথায় বহুত্বের লেশ নাই। কেবল একত্ব ও নিত্য চির-বিরাজমান। বহুত্বের মধ্য দিয়া সেই একত্বকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্র প্রবর্ত্তিত। এ মন্ত্র দেখাইতেছে যে,—'এখানে তেজ একটী; তবে যে ভিন্ন ভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, ইহা সেই অখণ্ড পুঞ্জীভূত তেজেরই অবভাস।' সুতরাং সেই একই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বহুজ্যোতিষ্মান্ পদার্থকে প্রকাশিত করিয়া জ্যোতিঃ-ধারায় বা জ্যোতিঃ-কেন্দ্ররূপে এই জগতের অন্তরালে নিয়ত বিরাজমান। এই মহাভাবকে অভিব্যক্ত করাই এ মন্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য বলিয়া বুঝিতে পারি।

* * *

এই মন্ত্র ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে সূর্য্যোপস্থানের জন্য স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সে কোন্ সূর্য্য? দৃশ্যমান্ ঐ সূর্য্যের উপস্থানের জন্য অর্থাৎ সূর্য্যকে উদ্গত করিবার জন্য অথবা সূর্য্যকে আহ্বান করিবার জন্য—যদি এ মন্ত্রের প্রয়োগ হইত, তাহা হইলে কেবল প্রাতঃকালে এই মন্ত্রের ব্যবহার হইলেই চলিত। ত্রিসন্ধ্যায় ইহা পাঠের আবশ্যকতা কেন? ফলতঃ, এই মন্ত্র এই সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত নহে। ইহা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল খণ্ড খণ্ড তেজের আধার সেই জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ড অনির্ব্বচনীয় তেজের—পুনঃপুনঃ স্মরণ করিতে—পুনঃপুনঃ মনন করিতে—পুনঃপুনঃ নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিতে—এ মন্ত্রটী সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে ত্রিসন্ধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। যদি পুনঃ-পুনঃ স্মরণ করিতে করিতে মহাভাবটী ফুটিয়া উঠে, ইহাই বৈদিক মন্ত্রের সাফল্য। নচেৎ, ঐ দৃশ্যমান সূর্য্যকে বা সামান্য তেজকে বা জ্যোতিকে লক্ষ্য করিতে এ মন্ত্র প্রবর্ত্তিত নহে।

* * *

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ—'মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ তেজোময় সূর্য্য উদিত হইয়া দ্যুলোককে পৃথিবীকে অন্তরিক্ষকে স্বীয় কিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তিনি স্থাবর-জঙ্গম পদার্থের প্রাণতুল্য।' মন্ত্রের সাধারণ ব্যাখ্যায় এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইলেও ইহার অভ্যন্তরে এক নিগূঢ় তত্ত্ব-কথার অভিব্যক্তি আছে। দৃশ্যমান্ সূর্য্য—স্থাবর-জঙ্গমের না হয় প্রাণতুল্য হইতে পারেন; কারণ, সূর্য্য-প্রকাশে সকল প্রাণীই প্রাণলাভ করে; কিন্তু মিত্র বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতির চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক—ইহার তাৎপর্য্য কি? সূর্য্যের প্রকাশক সূর্য্য—তাহাই বা কি প্রকার? এ সূর্য্যই বা কে? আর, ইহার প্রকাশক সূর্য্যই বা কে? সুতরাং ইহা চিন্তা করা কি উচিত নহে যে,—সূর্য্যের প্রকাশক যে সূর্য্য, অগ্নির প্রকাশক যে সূর্য্য—সে সূর্য্য কোন সূর্য্য? তিনিই পরমাত্মা! মন্ত্রে তো তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে! "সূর্য্যঃ আত্মা"—ইহাতে কি সূর্য্যকে পরমাত্মা বলা হইল না? অতএব, যে সূর্য্য নিখিল রশ্মিসমূহের বিদ্যোতক, যে সূর্য্য সূর্য্যের প্রকাশক, যে সূর্য্য বরুণের প্রকাশক, যে সূর্য্য অগ্নির প্রকাশক, যে সূর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্য গগন স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল বস্তুর উদ্ভাসক, সে সূর্য্য—পরমাত্মা, সে তেজঃ—পরমাত্মারই। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যাবন্দনা।

* * *

তবে যে পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহারও যে কারণ নাই, তাহা নহে। মানুষের ধ্যান-ধারণা সীমাবদ্ধ। তাই সসীমের মধ্য দিয়াই অসীমকে ধারণা করার প্রচেষ্টা; তাই দৃশ্যমানের মধ্য দিয়াই অদৃষ্টের সাক্ষাৎকার-লাভের প্রয়াস। যিনি বাঙ্-মনের অগোচর, যিনি নিরাকার নির্ব্বিকার, যিনি অনন্ত অসীম অপার, তাঁহার উদ্দেশ্যে যে স্তুতি-নতি বিহিত হয়, তাঁহাতে যে নানারূপের পরিকল্পনা দেখিতে পাই, তাঁহার যে অবস্থানাদির নানাপ্রকার নির্দ্দেশ সংসূচিত হয়; সে আর অন্য কিছুই নহে; সে কেবল—মানুষের ধ্যান-ধারণার ও বোধ-সৌকর্য্যের জন্য। অনলে অনিলে সলিলে—সর্ব্বব্যাপী তিনি—সর্ব্বত্রেই তাঁহার বিভূতির বিদ্যমানতা। অতএব, তদ্দ্বারাই তাঁহাতে উপস্থিত হওয়া যায়। তাই এই প্রকার উপাসনার প্রবর্ত্তনা।

—•—

জ্ঞান-বেদ।

—:•:•:—

ন হি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ।

জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সং গা অস্মভ্যং ধূনুহি॥

•.•

সংসারের চারিদিক শক্রতে ঘেরিয়া আছে। মানুষের শত্রু পদে পদে। আধিব্যাধি-শোকতাপের মধ্য দিয়া শত্রু আসিয়া বিপন্ন করিতেছে। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক দুঃখ-রূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া শত্রু আসিয়া যন্ত্রণা দিতেছে। সকল শত্রুর অপেক্ষা প্রবল শত্রু—আমাদের সঙ্গের সাথী নিত্য-সহচর কামক্রোধাদি রিপুবর্গ।

•.•

মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'শত্রুসংহারের জন্য ভগবানের যে মহিমা, তাহার অন্ত নাই; স্বর্গলোকে ও মর্ত্ত্যলোকে উভয় লোকেও সে মহিমা রাখিবার স্থান-সঙ্কুলান হয় না।' সত্যই তাই। রক্তবীজের বংশের ন্যায় শত্রু—মরিয়াও মরিতে চাহে না। তুমি কোন্ দিকের কোন্ শত্রু দমন করিবে? সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষে ঊর্দ্ধদেশে অধোভাগে অগণ্য অসংখ্য শত্রু লেলিহানজিহ্বায় তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। এরূপ অগণিত অধৃষ্য মহাপরাক্রান্ত শত্রু যিনি সংহার করিতে পারেন, তাঁহার যশের অন্ত আছে কি? মন্ত্র তাই বলিতেছেন—'ন হি ইন্বতঃ।'

•.•

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'স্বর্বতীঃ অপঃ জেষঃ।' এখানে 'জল জয় কর বা জল দান কর' সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। কিন্তু 'স্বর্বতীঃ' শব্দের সার্থকতা বুঝিতে গেলে, বুঝা যায়—এতদন্তর্গত 'অপঃ' সাধারণ জল নহে; উহা স্বর্গের অপ্ বা অমৃত। যাঁহারা মরুভূমির অধিবাসী, এক বিন্দু জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠ, তাঁহাদের নিকট সাধারণ জলই অমৃতের কাজ করিতে পারে; তাঁহারা 'স্বর্বতীঃ অপঃ' শব্দে সাধারণ জল অর্থই বুঝিয়া লউন; জল মাত্র প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদের পিপাসা দূর হইবে, সুতরাং তৃষ্ণারূপ কষ্টদায়ক শত্রু দমিত হইয়া যাইবে। কিন্তু এক রকম পিপাসা, একবিধ তৃষ্ণা, একপ্রকার শত্রু তো—মানুষকে আক্রমণ করে নাই! নানান্ রকম শত্রু—নানান্ ভাবে নানান্ দিক হইতে ঘেরিয়া আছে। তাহাদের আক্রমণ হইতে উদ্ধারের উপায় কি? শত্রু-সংহার জন্য যে ভগবানের যশঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে ধরে না, জলদানে পিপাসা-নিবারণ-রূপ ঐ সামান্য একটা শত্রুদমন দ্বারাই কি তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে? কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। ফলতঃ, যাহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের সকল তৃষ্ণা বা দুঃখ দূর হয়, অপ্ শব্দ তাহারই দ্যোতনা করিতেছে। সুতরাং সে অপ্ যে কি, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। সে অপ্—অমৃত; সে অপ্—অমৃত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; কেন-না, সকল প্রকার শত্রুদমনের বা জ্বালা নিবারণের সামগ্রী অমৃত ভিন্ন অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

* * *

এইবার বুঝিয়া দেখুন—মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—প্রার্থনার বিষয় কি? মন্ত্রের বাক্য—'গাঃ সং ধূনুহি।' ইহাতে সাধারণতঃ 'আমাদিগকে গরু দান কর' ভাবই উপলব্ধ হয়। আর এই জন্যই বেদ—'চাষার গান!' কৃষিজীবী যজমানের অভীষ্টপূরণ-কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়া পুরোহিত যখন স্তোত্র উচ্চারণ করিবেন, মন্ত্রে তখন কৃষির সহায়তামূলক জল-দানের বা গরু-দানের প্রার্থনা করিতে পারেন। কিন্তু অন্য সাধারণ ভক্তের প্রার্থনার সময় এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাব সূচিত হয় না কি? বিশেষতঃ, মন্ত্রের প্রথমাংশের ও মধ্যমাংশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, এই 'গাঃ' পদে একমাত্র 'গরু' অর্থ আসিতেই পারে না। গরু-দান প্রাপ্ত হইলে,

কয় দিকের কয়টা শত্রু দমিত হইবে? অগণ্য অনন্ত শত্রু—দুঃখ-পারাবার আমায় ঘেরিয়া আছে; দুইটা গরু পাইলে, আমার কতটুকু দুঃখ দূর হইবে, বা কয়টা শত্রু বিমর্দ্দিত হইতে পারিবে? শত্রুদমন জন্য যে ভগবানের যশঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে ধরে না, তাঁহার নিকট আমি কি চাহিব?—কি ধন দিয়া তিনি আমার সে শত্রু নাশ করিবেন? সকল শত্রুর নাশের বা সকল দুঃখ অবসানের নিমিত্ত—আমার কি চাই? চাই না কি—অমৃত? আবশ্যক নহে কি—অমৃতত্ব? অমৃতত্ব-প্রাপ্তিই চরম পরম লক্ষ্য। তিনি অমৃতের অধিকারী—অমৃত স্বরূপ। তিনি জ্ঞানময়—তিনি জ্ঞানার্ণব। মানুষ যতক্ষণ না সে অমৃতের অধিকারী হয়, আমরা যত দিন পর্য্যন্ত না সে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, কখনই আমাদের শত্রুনাশ সম্ভবপর নহে। অমৃতত্ব-প্রাপ্তি ঘটিলেই সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, কামনা-বিমুক্তির দ্বারা সকল শত্রুই ছিন্ন হয়। তখনই জীবন্মুক্ত অবস্থা। অমৃত অবস্থায় শত শত্রুও কিছুই করিতে পারে না।

এই অমৃতত্ব বিষয়ে উপনিষৎ কহিয়াছেন,—

'অমৃতত্বং সমাপ্নোতি যদা কামান্ স মুচ্যতে।
সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তশ্ছিত্ত্বা তং তু ন বধ্যতে।'

জীব! যদি শত্রুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, অমৃতত্ব-লাভের প্রার্থনা জানাও। শত্রুদমনে অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ সেই প্রকৃষ্ট অস্ত্রই তোমায় প্রদান করিবেন। সে অস্ত্র পাইলে, তখন তুমি সেই অবস্থায় উপনীত হইবে, যে অবস্থায়—

'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্।'

তখন আশা আকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণা সকলই 'দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায়' ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যই এই মন্ত্র আলোচনায় সর্ব্বথা অনুধাবনীয়।

—•—

জ্ঞান-বেদ।

ইত্থা হি সোম ইন্মদে ব্রহ্মা চকার বর্দ্ধনম্

শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃ শশা

অহিমর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১ ॥

* * *

স ত্বামদদ্বৃষা মদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ

যেনা বৃত্রং নিরদ্ভ্যো জঘন্থ

বজ্রিন্নোজসার্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ২ ॥

* * *

অধুনা 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। নানা দিকে নানা ভাবে 'স্বরাজের' নামে বাদ-বিতণ্ডা চলিয়াছে; নানা দিকে নানা পদ্ধতিতে স্বরাজ-সম্পর্কে বিচার-বিতর্ক শুনা যাইতেছে। ব্যাখ্যা কত রকমেরই হইতেছে; কত জনের কত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি কত প্রকারেই স্বরাজের

বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। সুতরাং স্বরাজ-লাভের প্রচেষ্টাও বিভিন্ন বিপরীত ভাবে দেখা যাইতেছে। এ সময় আমরা যদি শাস্ত্রানুমত স্বরাজের ব্যাখ্যা করি, বেদানুগত স্বরাজ বুঝাইবার চেষ্টা পাই, বোধ হয়, তাহা অসাময়িক ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

• . •

বেদে স্বরাজ্য (স্বরাজ) সম্বন্ধে একটী সূক্তে ষোলটী মন্ত্র আছে। কি করিয়া কি উপায়ে স্বরাজ্য (স্বরাজ) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেই মন্ত্র-কয়েকটীতে তাহারই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গ-শীর্ষে যে মন্ত্র-দুইটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাকে স্বরাজ্য-লাভের সোপান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্র দুইটী স্বরাজ-তত্ত্ব-পরিজ্ঞাপক এবং তদ্বিষয়ক প্রার্থনা-মূলক। প্রথমে বুঝিয়া দেখুন—ঐ মন্ত্রের প্রথম চরণে কি বলা হইয়াছে! বলা হইয়াছে—'উপাসক যখন বিধিক্রমে যথাশাস্ত্র (ইত্থা) আনন্দপ্রদ (মদে) শুদ্ধসত্ত্বে বা সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে (সোমে) পরিমগ্ন রহেন, তখন বিধাতা (ব্রহ্মা) নিশ্চিত (হি) উপাসকের শ্রেয়োবিধান বা শ্রীবৃদ্ধিসাধন (বর্দ্ধনং) করিয়া থাকেন (চকার)।' এখানকার উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তোমরা যথাশাস্ত্র সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে—শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; বিধাতাই সর্ব্বতোভাবে তোমাদিগের শ্রেয়ঃসাধন করিবেন।'

• . •

সূচনায় সৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করিয়া, উপসংহারে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে অমিত-বলশালিন্ (শবিষ্ঠ)! হে শত্রুবিনাশিন্ (বজ্রিন্)! আপনার শক্তির দ্বারা অথবা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশে (ওজসা) ইহলোক হইতে (পৃথিব্যাঃ) সর্প-প্রকৃতিবিশিষ্ট ক্রূরস্বভাব রিপুকে অর্থাৎ পাপকে (অহিং) নিরন্তর শাসন করুন—নিঃশেষে বিতাড়িত করুন (নিঃ শশাঃ)।' এই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! এই করুন—যেন রিপুগণ আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে—যেন পাপ আমাতে সংলিপ্ত না হয়।' রিপুর আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিতে পারিলে, পাপের প্রভাব হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইলে, আপনিই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐরূপে অর্থাৎ পাপের প্রভাবকে দূরে রাখিয়া (অনু) স্বরাজ্য (স্বরাজ্যং) ইহজগতে

প্রতিষ্ঠিত হউক (অর্চ্চন)।' এখানকার "অহিমর্চ্চন্নমু স্বরাজ্যং" এই মন্ত্রাংশ হইতে প্রার্থনা-পক্ষে দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু সেই দ্বিবিধ অর্থেরই মর্ম্ম অভিন্ন। সেই দুই অর্থ,—'হে ভগবন্! এই প্রকারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা (প্রকটন) করিয়া সর্পস্বভাব পাপকে ইহলোক হইতে দূরীভূত করুন।' অথবা,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্মে রত করিয়া, পাপ-সংস্রব হইতে দূরে রাখিয়া, এ সংসারে স্বরাজ্যের বা স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করুন।'—ফলতঃ, রিপুর আক্রমণ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখা অর্থাৎ পাপ-সংস্রব হইতে নির্লিপ্ত থাকাই—স্বরাজ্য (স্বরাজ) লাভ। যে জন রিপুর বশীভূত নহেন, ভগবৎ-কৃপায় যিনি পাপকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই স্বরাজ্য (স্বরাজ) লাভের অধিকারী হয়েন। আমাদিগের পরমপূজ্য বেদ এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন।

* * *

এইরূপে প্রথম মন্ত্রে স্বরাজ-তত্ত্বের আভাস প্রদান-পূর্ব্বক, দ্বিতীয় মন্ত্রে স্বরাজ-লাভ-পক্ষে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা কেমন করিয়া স্বরাজ লাভের অধিকারী হইব? কি করিয়া স্বরাজ আমাদিগের অধিগত হইবে? মনকে বা আপনার আত্মাকে স্বরাজ-লাভ পক্ষে কিরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে? দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাত রহিয়াছে দেখিতে পাই।

* * *

উক্ত মন্ত্রেরও দুইটী চরণে দ্বিবিধ ভাব প্রকাশমান্। প্রথম চরণে আত্মোদ্বোধনা এবং দ্বিতীয় চরণে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সেই আত্মোদ্বোধনা ও প্রার্থনার মূলে স্বরাজ-তত্ত্ব প্রকটিত দেখিতে পাই। প্রথমে আপনার মনকে বা আপনাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'হে আমার মন! অথবা হে আমার আত্মা! অভীষ্টপূরক অর্থাৎ দুঃখনাশক (বৃষা) আনন্দপ্রদ (মদঃ) ভগবানে ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক কর্তৃক আনীত অর্থাৎ সাধু-সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত (শ্যেনাভৃতঃ) বিশুদ্ধ পবিত্র (সুতঃ) সেই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বরাজ্য-সংস্থাপক (সঃ) শুদ্ধসত্ত্বভাব অথবা সৎকর্ম্ম (সোমঃ) তোমাকে (ত্বা) আনন্দদান করুক (অমদৎ)।' এই আত্মোদ্বোধনার মর্ম্ম এই যে,—'তুমি সাধুসংসর্গ লাভ কর; সাধুগণের নিকট হইতে পবিত্র শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হও; তাহাই

তোমার স্বরাজ্য-সংস্থাপক হইবে এবং তাহাই তোমাকে পরমানন্দ প্রদান করিবে।' সাধুগণের অনুসারী হইয়া, সৎকর্ম্মের সমাধান করা এবং তদ্দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হওয়া—ইহাই স্বরাজ্য-লাভ। এখানে এই মন্ত্রাংশে এই তত্ত্বই অবগত হই—এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হই।

* * *

দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'পাপ-নাশে দৃঢ়ায়ুধসম্পন্ন হে ভগবন্ (বজ্রিন্)! যে কারণে অর্থাৎ আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সম্পন্নতা-নিবন্ধন (যেন) আপনি আপনার বলের দ্বারা অথবা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশে (ওজসা) আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব-সকাশ হইতে অথবা হৃদয় হইতে (অদ্ভ্যঃ) অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে (বৃত্রং) নিঃশেষে বিনাশ করেন—নিয়ত বিতাড়িত করেন (নিঃ জঘন্থ); এবম্প্রকারে ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক (অর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যম্)।' এই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের অজ্ঞানতাকে দূর করুন; রিপুসমূহকে বিনাশ করুন; তদ্দ্বারা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।' এইরূপে বুঝা যায়, সাধুসঙ্গ-লাভে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবানের কৃপায় অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়; আর, তাহারই ফলে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমরা শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হইলে, আমরা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারিলে, ভগবান্ আপনার শক্তি বিকাশ করিয়া, আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক, আমাদিগের হৃদয় হইতে অথবা আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের নিকট হইতে, অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে বিতাড়িত করেন। তাহার ফল কি হয়? "অর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যম্" মন্ত্রাংশ ইহাই দ্যোতনা করিতেছে! আমরা যদি সাধু-সঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে দিনাতিপাতে প্রবৃত্ত হই, আমাদিগের মন যদি শুদ্ধসত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়, আমরা যদি সৎকর্ম্মের সাধনায় সর্ব্বথা ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে, তাহারই ফলে, ভগবান্ আমাদিগের অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া আমাদিগের পাপকে নাশ করিয়া, এ সংসারে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। ইহাই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। সমর্থ হইবে কি—স্বরাজ-প্রতিষ্ঠায়?

জ্ঞান-বেদ।

—:+*+:—

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্য্যাণাম্।

ইন্দ্রং সোমে সচাসুতে॥

* * *

সংসার—স্বার্থ-বিমুগ্ধ। বিনা উদ্দেশ্যে—বিনা প্রয়োজনে, সে কোনও কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না। এতই স্বার্থান্ধ সে—যে, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বেও সে তাহার মনের মত প্রয়োজন আরোপ করিয়া বসে। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি।" তাই সচরাচর দেখিতে পাই,—প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য ভিন্ন কেহ কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সকলেই প্রবৃত্ত-কর্ম্মের দাস; নিবৃত্ত-কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি নাই।

* * *

কিন্তু প্রবৃত্ত-কর্ম্মের মধ্য দিয়াই নিবৃত্ত-কর্ম্মে উপনীত হইতে হইবে। স্বার্থসাধনের মধ্য দিয়াই পরার্থ-সাধনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি—শাস্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির এই ত্রিবিধ পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই তিনের মধ্যে আবার কর্ম্মই প্রধান। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান জন্মে না; জ্ঞান ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না। সকলেরই মূল—কর্ম্ম। সেই জন্য সকল শাস্ত্রেই কর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত; সেই জন্য, সংসারকে কর্ম্মানুসারী করিবার উদ্দেশ্যে, শাস্ত্রের অশেষ প্রযত্ন দেখিতে পাই।

* * *

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্মই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র পন্থা। ফলমাত্রই যখন কর্ম্মের অনুসারী, আর ফললাভ-কামনাই যখন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, তখন কর্ম্মের অনুগমন ভিন্ন সংসারীর প্রকৃষ্ট পন্থা আর কি আছে? নির্ব্বাণই বল, মুক্তিই বল, ভগবৎ-সামীপ্যই বল,—কর্ম্ম হইতেই সকল পথ প্রশস্ত হয়। তাই সংসারী জীবকে কর্ম্মঠ করিয়া, তাহাকে তাঁহার সামীপ্য-লাভের উপযুক্ত করিবার জন্যই, ভগবানের যত কিছু প্রয়াস। অনন্ত-কর্ম্মী তিনি; তাই জ্যোতির্ম্ময় তরুণ-অরুণ-রূপে বিকাশ পাইয়া তিনি সংসারী জীবকে কর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতেছেন। কর্ম্ম আবার উৎকর্ষের অনুসারী। প্রকৃতির কর্ম্ম—স্রষ্টার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-সাধন। সেই জন্যই প্রকৃতি কর্ম্ম-নিরত রহিয়াছে। পূর্ণতা-সাধনই প্রকৃতির কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। সেই সূত্র ধরিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিলেই, তাঁহার অনুবর্ত্তী হওয়া যায়। সেই কর্ম্ম-সূত্র যাহাতে সরল সুগম হয়, শাস্ত্রে তাহার অশেষ প্রয়াস আছে। সেই জন্যই, সেই কর্ম্ম-সূত্রে সরল সুগম করিবার অভিপ্রায়েই, ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তির—বিভিন্ন নামের কল্পনা হইয়া থাকে। তাই তিনি প্রেমময়—তাই তিনি প্রেম-স্বরূপ। তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগী হইয়া মানুষ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, সেই কর্ম্মই—কর্ম্ম, সেই কর্ম্মই—ধর্ম্ম।

* * *

কিন্তু সেই কর্ম্মানুষ্ঠানেরও বিবিধ অন্তরায় আছে। সেই সকল অন্তরায়ের বিষয় স্মরণ করিয়া পাছে কেহ সে অনুষ্ঠানে বিরত হয়, এই আশঙ্কায় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি 'পুরুতমং;' অর্থাৎ—তিনি বহু-শত্রুনাশক। তুমি তাঁহার কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; তাহাতে যদি কোনও বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সে বাধা তিনিই দূর করিবেন। তিনি বহু শত্রুর নাশক; তোমার শত্রু-সমূহের তিনি সংহার-সাধন করিবেন। তিনি পুরুতম; তোমার ভাবনা কিসের? তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করাইবেন। উপলক্ষ তুমি; তুমি তাঁহার কর্ম্ম-সম্পাদনে তৎপর হও। কর্ম্মময় সংসারে তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিও না। কর্ম্ম কর—তাঁহার প্রীতির জন্য; কর্ম্ম কর—তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবার জন্য।

—•—

জ্ঞান-বেদ।

—:❀ ❀ ❀:—

ঐভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে।

দেবেভির্যাহি যক্ষি চ॥

* * *

হে অগ্নিদেব! সোম-পানের জন্ত (ভক্তসুধা গ্রহণের জন্ত), আমাদের পরিচর্য্যার
ও স্তোত্রের নিকট, আমাদের অভিলাষানুরূপ বিশ্বের সর্ব্বদেবতার সহিত,
আপনি আগমন করুন ; এবং (আসিয়া) আমাদের যজ্ঞ
সম্পাদন (অভীষ্ট-পূরণ) করিয়া দিউন।

* * *

বিপদে পরিত্রাণ-লাভের আশায়, সম্পদে সুখবৃদ্ধির কামনায়, দুঃখের দহন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি করিবার আকাঙ্ক্ষায়, সুখের অবিরাম অচ্ছিন্ন প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার স্পৃহায়, সকল সময়, সকল অবস্থায়, বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করার প্রয়োজন হয়। আস্তিক নাস্তিক সকলেই প্রকারান্তরে দেবতার আহ্বান করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, আমরা মনে করি, তাঁহারাও দেবদ্বারে স্বতঃই প্রার্থী হইয়া আছেন। ইহসংসারে এমন মনুষ্য বিরল,—যাহারা কোন-না-কোনও ভাবে দেবতার শরণাপন্ন হয় নাই বা দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত নহে।

* * *

দেবতার সহিত সম্বন্ধ কিছু-না-কিছু সকলেরই আছে। কিন্তু দেবতা যে কি বস্তু, তাহা অতি অল্প লোকই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা অতি অল্প-জনেরই ধারণা-পথে দেবতত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়াছে। দেবতা-বিষয়ক কিম্বদন্তী নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। শাস্ত্রে দেখি, রূপকের কল্পনায় কল্পিত আছে, দেবতা কত কত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কত কত স্থানে কত কত ভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। পুরাণে দেখি, লোক মুখে শুনি,—যজ্ঞে আসিয়া তাঁহারা যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, একের পক্ষ হইয়া অন্যের সংহার সাধনে প্রযত্নপর রহিয়াছেন। দেবগণ-সম্বন্ধে এইরূপ যে কত কথাই প্রচারিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি কিন্তু সহসা হৃদ্‌গম্য হয় না যে, দেবতাই বা কি?—আর তাঁহাদের স্বরূপই বা কি? নিবিষ্টচিত্তে অনুধ্যান করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যত কথা উল্লিখিত আছে—সকল কথার সামঞ্জস্য-সাধন লক্ষ্য করিতে হইলে, বুঝা যায় না কি,—দেবগণ স্বরূপতঃ কি? তাঁহারা শরীরী কি অশরীরী?

* * *

দেবগণ তোমার-আমার ন্যায় দেহধারী নহেন। তোমার প্রদত্ত স্থূল-উপাদানভূত ঐ অন্নজল গ্রহণ করিতে অথবা যজ্ঞহবিঃ পান করিতে, তাঁহারা কখনও তোমার দৃশ্যমান্ স্থূলদেহে আসিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন না। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষকারী এমন কেহ বোধ হয় এ জগতে নাই—যিনি সে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। বিরল বটে; কিন্তু এখনও তো যজ্ঞ হয়! বিরল বটে; কিন্তু এখনও তো যজ্ঞহবিঃ গগন চুম্বন করে! বিরল বটে; কিন্তু এখনও তো দেবতার উদ্দেশে ভক্ষ্য ভোজ্য ষোড়শোপচার সাজাইয়া সেই মন্ত্রে সেই ভাবেই দেবতার আহ্বান করা হয়! কিন্তু কৈ, কেহ দেখিয়াছেন কি,—কখনও কখনও কোথাও দেহধারী দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে! কদাচিৎ সে সংবাদ শুনিতে পাই। কেহ কখনও সে বিষয় মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারেন না। কেবল এখন বলিয়া নহে; কোনওকালে কখনও যজ্ঞক্ষেত্রে যে দেহধারী দেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা অনুভবে আসে না। পুরাণে রূপকে যে সকল ঘটনা পরিবর্ণিত আছে, তাহাও এ রাজ্যের নহে,—কল্পনার অতীত সে এক অন্য রাজ্যের কাহিনী বলিয়াই মনে হয়।

* *

তবে কি? যজ্ঞাদিতে দেবতার আবির্ভাব বলিতে তবে কি বুঝিব? কিরূপে কি ভাবেই বা যজ্ঞক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিষ্ঠান হয়? কেমন করিয়াই বা তাঁহারা কৃপা-বিতরণে মানব-সমাজকে কৃতকৃতার্থ করেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর-দান বড়ই কঠিন; অল্পকথায়ও সে উত্তর ব্যক্ত হইবার নহে; আবার যতই অধিক কথা কহিতে যাইবে, ভাব গ্রহণ ততই জটিল হইয়া পড়িবে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর—বাক্যে নহে—অনুভাবনায়; বক্তৃতায় নহে—অনুধ্যানে; ভাষায় নহে—চিন্তায়। তথাপি প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে বিষয়টী একটু বিস্তার করিবার প্রয়াস পাইতেছি। মনে রাখিবেন,—দেবগণ দেহধারী নহেন—অশরীরী—শুদ্ধসত্ত্বরূপে তাঁহারা ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন ও বিচরণ করিতেছেন। তেজোরূপে, বায়ু-রূপে, অপ্-রূপে, সত্য-রূপে, সৎস্বরূপে, তাঁহাদের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। প্রাণ তোমার যে ভাবে তাঁহাদের পাইতে চাহিবে, সেই ভাবের সূক্ষ্মতত্ত্ব পরমাণু-রূপে আসিয়া তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইবেন। বীজটীকে তুমি যখন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রোপণ কর, তাহাকে মুকুলিত মুঞ্জরিত পল্লবিত করিবার পক্ষে কে আসিয়া সহায়তা করে? ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না; তাহারা আপনিই আসিয়া বীজটীকে নবজীবন প্রদান করে; কেহ দেখিতে পায় না, কাহারও দেখিবার অপেক্ষাও থাকে না, এমনই ভাবে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ-সম্পর্কেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। তোমার বীজবপন-রূপ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে, তোমার দেহ-মনঃপ্রাণ এক হইয়া সদনুষ্ঠানে উন্মুখ হইলে, তখন একে একে সর্ব্ব-দেবগণ—তাঁহাদের সূক্ষ্মসত্ত্ব ভাব-বিভূতি—তোমার সর্ব্বপ্রকার সদ্বৃত্তি-সদ্ভাবের মধ্য দিয়া তোমার মধ্যে প্রকট হইবেন। দেবতার অধিষ্ঠান—দেবতার আগমন তাহাকেই বলে। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশই দেবাধিষ্ঠান।

* * *

অতঃপর দেবতার সহিত মানবের সম্বন্ধ কি প্রকারে স্থাপিত হয়, একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। বলিয়াছি,—দেবগণ অশরীরী, শুদ্ধসত্ত্বভাবে সূক্ষ্মদেহে বিদ্যমান আছেন। দেহধারী শরীরী জীবের সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে, শরীরের দেহের ক্রিয়া আবশ্যক করে। স্থূলের

সম্বন্ধ স্থূলের সহিত সাধিত হয়। কিন্তু যাহা স্থূলের অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তাহার সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে, সে কি স্থূলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? কখনই না। সেখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম সামগ্রীর সহায়তা আবশ্যক করে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। বহির্জগতে যে কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তর্জগতের পক্ষে সে কর্ম্ম আদৌ কার্য্যকরী হয় না। স্থূলের পক্ষে এক, সূক্ষ্মের পক্ষে এক, বহির্জগতের পক্ষে এক, অন্তর্জগতের পক্ষে এক ;—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্য্যকারিতা আছে। যাহা দৈহিক শক্তির কার্য্য, তাহা দৈহিক বলের আবশ্যক করে। যাহা মানসিক শক্তির কার্য্য, তাহা মানসিক বলের অপেক্ষা করে। মনে করুন, সম্মুখে একটী মোট পড়িয়া আছে; আমাকে তাহা বহন করিতে হইবে। এখানে আমার দৈহিক শক্তির কার্য্য আবশ্যক। কেবল মানসিক শক্তি প্রয়োগে কোনরূপ ফললাভ সম্ভব নহে। কিন্তু মানসিক শক্তি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আবার দেখুন! আমায় একটী বেদমন্ত্র স্মরণ করিতে হইবে। সেখানে শত দৈহিক শক্তিতে কোনও কাজ হইবে না। একভাব—পরিদৃশ্যমান্; অপর ভাব—অ-দৃষ্ট। স্থূল-সূক্ষ্মের কার্য্য স্থূলতঃ এই দৃষ্টান্তেই বোধগম্য হইতে পারে। অতএব, সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের দ্বারা সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিতে হইবে। স্থূলের দ্বারা সে শুদ্ধ-সত্ত্বভাব কদাচ অধিগম্য নহে। অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিসমূহ সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া, সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। বিশুদ্ধা ভক্তি, সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের জনয়িত্রী,—হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিচয়কে তদ্ভাবে ভাবিত ও তদঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি-ভাবের উন্মেষ—আর তদর্থে যজ্ঞাহুতি প্রদান—বেদে সুসংস্কৃত সোম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেবগণের উদ্দেশ্যে সোম দান—সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব-মূলক বিশুদ্ধা ভক্তি—যজ্ঞভাগের সূক্ষ্ম শুদ্ধ-সত্ত্ব অংশ সমর্পণ। ইহাই সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আমাদের সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবের সম্মিলন।

জ্ঞান-বেদ।

—:•:—

ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥

* . *

বেদে নানা দেবতার উপাসনার কথা আছে। শীর্ষোক্ত মন্ত্রে তাহারই মর্ম্ম অনুধাবন করা যায়। মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—'সামগায়ী উদ্গাতৃগণ সামমন্ত্রে যে গান করেন, সে তো তোমারই স্তুতিগান। ঋগ্বেদীয় হোতৃগণের উচ্চারিত ঋঙ্মন্ত্রসমূহ—সে তো তোমারই স্তুতি! অধ্বর্য্যুগণের যে যজুর্ম্মন্ত্র—সে সকল তো তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হয়! এক কথায়, ত্রয়ী (বেদ) তোমারই স্তুতিগানে বিনিযুক্ত আছে।' এখন বুঝিয়া দেখুন,—কে সে ইন্দ্রদেব?—কাহার সে উপাসনা?

* . *

নাম দেখিয়া বিচঞ্চল হও কেন? তিনি যে অনন্ত! তাঁহার যে অনন্ত নাম! ইন্দ্র তাঁহার সেই অনন্ত নামের একটী নাম মাত্র। যেমন তাঁহার নামের অন্ত নাই, তেমনই তাঁহার কর্ম্মেরও অন্ত নাই। অনন্তকর্ম্মী

বলিয়াই অনন্ত-রূপ-গুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাঁহাকে উদ্ভাসিত দেখি। যাঁহারা ইন্দ্র নামে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন ('ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' অর্থাৎ ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহুরূপে উৎপন্ন হন); যাঁহারা বিষ্ণু, হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ-কারণ-রূপে ঘোষণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদিগের বোধ-শক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিরনেত্রে স্থিরচিত্তে ভগবানের এই অনন্ত মহিমা দর্শন করেন।

* * *

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে; কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ। জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব। ত্রিবিধ চিত্তে জগৎ-সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি (পঞ্চদশী); যথা,—

"তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিক লৌকিকঃ॥"

পরিদৃশ্যমান্ যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এতাদৃশ বিরুদ্ধমত ভাবের অধ্যাস হয়; তখন যিনি অবাঙ্মনসোগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে—তাঁহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে—যে বহু মতবাদ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

* *

উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। ইহাই অধিকার-বাদ। আমাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ যে কঠোর-কঠিন-ভাবে অধিকারী-অনধিকারীর স্তর-পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ, তাঁহাদিগের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষয়ে অভিনিবেশ-পক্ষে উপদেশ-দান উদ্দেশ্য মাত্র। এই দেখুন না কেন,—আমাদিগের ষড়্দর্শন! সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখ-

নাশ—অনাবিল সুখসাধন; অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী, বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক—শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। শ্রুতি সেই কথাই কহিয়াছেন,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

—মুণ্ডকোপনিষৎ।

যথা,—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

—কঠোপনিষৎ।

* *

নদী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু সে যখন সাগরে গিয়া মিশিয়া যায়, তখন তাহার নাম-রূপ সমস্ত লোপ পায়। সচ্চিদানন্দ-সাগরে মিলিতে পারিলে, চিত্তনদী সেইরূপ নামরূপ-বিমুক্ত হয়। জীবের তাহাই প্রার্থনীয়। মানুষের সেই লক্ষ্যই হউক। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নাম-রূপে বিমুক্ত হইয়া, মানুষ, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরেই লীন হউক। এইরূপ, সামগানকারী উদ্গাতৃগণ যে ইন্দ্রের গুণগান করেন, ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ যে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করেন, অথবা যজুর্ব্বেদীয় অধ্বর্য্যুগণ যে ইন্দ্রের স্তব করিয়া থাকেন; তিনি সেই এক—তিনি সেই অভিন্ন। এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবেই তাঁহাতে মিশিতে হইবে, এই রূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে। তাঁহাতে ভেদভাব—সে কেবল মানুষের ভ্রান্তিমাত্র।

* * *

ভগবানের অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি তাঁহার এক এক নামের বা এক এক রূপের পরিচয় মাত্র। তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে, নাম-রূপের সকল বিতণ্ডা বিলুপ্ত হয়। বেদে বহু দেবদেবীর নাম-রূপের অধ্যাস দেখিয়া বিভ্রান্ত হইবার কোনই কারণ নাই। তাঁহার এক এক বিভূতি, এক এক নাম-রূপে প্রকাশমান। তিনি সেই অদ্বিতীয় অভিন্ন একই আছেন।

জ্ঞান-বেদ।

—‡•‡—

।   ।   ।   ।
পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছাবিপশ্চিতম্।

।   ।
যস্তে সখিভ্য আবরম্॥

শাস্ত্রে ভক্তির নয়টী লক্ষণ উল্লিখিত আছে;—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন ইত্যাদি। তন্মধ্যে আত্ম-নিবেদন অন্যতম।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥"

এখানে সেই আত্ম-নিবেদনের প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। আত্ম-নিবেদন যে শ্রেয়ঃসাধক, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন।

* * *

আত্ম-নিবেদনে শ্রেয়োলাভের মাহাত্ম্য-কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ পরিব্যক্ত আছে। যথা,—"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" অর্থাৎ—'হে উদ্ধব, তোমাকে সার বলিতেছি। সংসারী জীব যখন সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে আমাকে আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে। প্রতি পদে যদি তাহারা সেই অমৃতত্ব লাভের প্রয়াস পায়, তাহা হইলেই তাহারা আমার মত হইবার উপযোগী হইতে পারে। ফলে, আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া

তাহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের দ্বারাই আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তখন আমার সহিত তাহাদের কোনও স্বতন্ত্রতা থাকে না, অর্থাৎ আত্মায় আত্ম-সম্মিলন ঘটে।

* * *

দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশে আত্ম-নিবেদন মাহাত্ম্য সম্যক্ পরিব্যক্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাই। যথা,—"ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা। মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥" অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে প্রহ্লাদ বুঝাইতেছেন,—'অন্তর্য্যামী পরম সুহৃৎ পুরুষোত্তমে যখন জীব আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার মায়া-বন্ধন টুটিয়া যায়।' ভগবান্ বলিয়াছেন,—"সর্ব্বং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর—আমাতেই আত্মসমর্পণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব; অর্থাৎ, আমাতে আত্মসমর্পণ করিলে তোমার জন্মগতি রোধ হইবে।

* * *

সকল শাস্ত্রেই ভক্তির মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। একমাত্র ভক্তি-প্রভাবেই সুকৃতি সঞ্চয় হয়—ভগবানের পরম প্রসাদ লাভ করা যায়। একমাত্র ঐকান্তিকী ভক্তি ভিন্ন—একমাত্র আত্মনিবেদন ভিন্ন, কোনও অনুষ্ঠানই মানুষকে সর্ব্বতোভাবে পরম পদে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। বিশ্বরূপ-দর্শনে বিমুগ্ধ চকিত ভীত ত্রস্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহায়। যতক্ষণ না অনন্যা-ভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ কেহই তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে না। স্বরূপ-তত্ত্ব না জানিতে পারিলে, কেহই মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না।

* * *

এই অনন্যা ভক্তি কিরূপে লাভ হয়? যখন ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া সকল কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত হইবে, তখনই অনন্যা ভক্তি আসিবে—তখনই ভক্ত আত্ম-নিবেদন করিতে সমর্থ হইবে। তখন সাধক কায়-

মনোবাক্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। তখন, সেই ভাব আসিবে, সেই ভাবে প্রাণমন মাতোয়ারা হইবে,—তখন সেই ভাবে তন্ময়তা আসিবে,—যে ভাবে ভক্ত সাধক—"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ। করোতি যৎ তৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"—নারায়ণকে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন। তখন ভক্ত সাধক যাহা কিছু করিবেন, সকলই ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে। তখন তাঁহার প্রার্থনাই হইবে,—"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥" তখন তাঁহার একমাত্র কামনাই হইবে,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

'চরণ ধরিয়া রহিলাম। কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়, আলিঙ্গন কর; রাগান্বিত হইয়া পদদলিত করিতে হয়, পদদলন কর; দেখা দিতে হয়, দেখা দেও; অথবা অদর্শনে মর্ম্মাহত করিতে হয়, মর্ম্মাহত কর।' অর্থাৎ, যাঁহাতে তাঁহার সুখ, তাহাই আমার সুখসৌভাগ্য; তিনি আমার প্রাণনাথ প্রাণপতি; তিনি আমার পর নহেন। এই ভাবই অভেদ-ভাব; এই ভাবই—আত্ম-নিবেদন। এই ভাবেই পরাগতি মুক্তি লাভ হয়,—এই ভাবেই আত্মায় আত্ম-সম্মিলন ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রে এই আত্ম-নিবেদনের উদ্বোধনাই প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইয়াছে,—"হে মন! যিনি সকল বন্ধুর শ্রেষ্ঠ, সেই দেবতার নিকট আত্ম-নিবেদন কর। তাঁহাতেই তোমার সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে।'

জ্ঞান-বেদ।

—:✤✱✤:—

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা।

ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি॥

.

অরূপের অনন্ত রূপ ধারণা হয় না বলিয়াই অরূপে রূপের কল্পনা করা হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ বলিয়া, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে পাই। আমরা মনে করি, তাঁহার অনন্ত রূপ, তাই তাঁহাকে অ-রূপ বলা হয়। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নির্গুণ, আমাদের চিত্তে সে সে ভাব কখনও জাগরূক হয় না। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই, অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ,—এই জন্যই তাঁহার নির্গুণ (অনন্ত গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও, তাঁহার অনন্ত রূপ ও অনন্ত গুণ জানিয়াও, তাঁহাতে যে রূপ-বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আমাদের আত্ম-তৃপ্তির জন্য। আমাদের সান্ত-হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য মনে করি বলিয়াই আমরা আবশ্যক অনুসারে অনন্তে রূপ-গুণের আরোপ করি। লক্ষ্য—এই সান্তের মধ্য দিয়া—এই রূপের মধ্য দিয়া—যদি সেই অনন্তে বা সেই অরূপে পৌঁছিতে পারি।

.

কিন্তু সময় সময় হিতে বিপরীত ফল সঙ্ঘটিত হয়। অরূপে রূপের আরোপ, নির্গুণে গুণের দ্যোতনা, সর্ব্ব-ব্যাপকের স্থান-বিশেষে অবস্থিতির কল্পনা,—অনেক সময় অনর্থের সূচনা করে। অনেক সময় মহাপুরুষগণ তাই ভগবানের রূপ-গুণ-অবস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া তৃপ্ত হন না। তিনি যে রূপ-বিবর্জ্জিত, অথচ ধ্যানে তাঁহার রূপ-কল্পনা করি; তিনি যে অখিলগুরু অনির্ব্বচনীয়, অথচ স্তবে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয়ত্ব দূর করি; তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, অথচ তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তীর্থ-বিশেষে তাঁহার অবস্থিতি অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব নষ্ট করি। এ একটা মানুষের প্রকৃতি। সাধকের হৃদয়ে অনেকে সময় এজন্য একটা অনুতাপ আসে। তাঁহাকে রূপ-গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াও, সাধক তাই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিতেছেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতঃ ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—"যেন এই রূপের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্তুতির মধ্যেই—ধ্যানের নিগড়েই তোমাকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হই। যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গণ্ডীতেই তোমায় আবদ্ধ দেখি।" তাই তাঁহারা বলেন,—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥"

'কি আকাশ, কি অনল, কি অনিল, কি সলিল, কি পৃথিবী, কি নক্ষত্রদল, কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিক্‌সমূহ, কি তরু-লতা-ফুলফল, কি সরিৎ, কি ভূধর, কি কন্দর,—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।'

* * *

ভক্ত এই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করে,—এই ভাবেই তাঁহাকে প্রণাম করে; সাধক এই ভাবেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করে,—এই ভাবেই তাঁহাতে পূজাপরায়ণ হয়; যোগী এই ভাবেই তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকে;—এই

ভাবেই তাঁহাতে ন্যস্তচিত্ত রহে। প্রণম্য সকলেই ; কেবল মনে থাকিলেই হয় যে, সে সকলই তাঁহার অঙ্গীভূত। আমরা যে মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা করি, আমরা যে ধ্যানেই তাঁহাকে ধারণা করি, আমরা যে স্থানেই তাঁহার অবস্থিতি কল্পনা করি, সকলই তাঁহারই উদ্দেশ্যে বিহিত হইতেছে—মনে রাখিলেই শ্রেয়োলাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসে। এই কারণেই অগ্নি-ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ ; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ-শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা ; এই কারণেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী-কালী-দুর্গা-তারা মহাবিদ্যা প্রভৃতির অর্চ্চনা, এই কারণেই অগণ্য অসংখ্য তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা। শীর্ষোদ্ধৃত মন্ত্রে যে দেবী সরস্বতীর মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে, তাহারও মর্ম্ম এই।

* * *

বুঝিয়া দেখুন দেখি,—কে সে সরস্বতী? মন্ত্রে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে! বলা হইয়াছে,—'দেবী সরস্বতী কর্ম্মদ্বারা (প্রজ্ঞানের দ্বারা) মহঃ অর্ণের (বিশ্বব্যাপী অপের) বিষয় জ্ঞাপন করেন ; অর্থাৎ, তিনি যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, তাঁহার কর্ম্ম দ্বারাই তাহা জানিতে পারি ; তিনি বিশ্বের সকল জ্ঞানের উন্মেষ করিয়াছেন। ভাব এই যে, কর্ম্মের দ্বারাই দেবতত্ত্ব অবগত হই ; তাহাতেই প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয়।' আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়া, অনন্তকে সান্ত রূপ-গুণে বিভূষিত করিয়া, সান্তের মধ্য দিয়াই, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। রূপ-বিবর্জ্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে আবদ্ধ, সর্ব্বব্যাপীকে স্থান-বিশেষে অবস্থিতির পরিকল্পনা—এই কারণেই বিহিত হয়।

জ্ঞান-বেদ।

—:ঃ*ঃ:—

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্‌শী গোমতী মহী।

পক্কা শাখা ন দাশুষে॥

* * *

এই মন্ত্র ভগবদ্বাক্যের অর্থাৎ মন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। ভগবন্মুখবিনিঃসৃত যে বাক্য বা মন্ত্র, তাহার শক্তি অপরিসীম! সে বাক্য 'সূনৃত' অর্থাৎ প্রিয় অথচ সত্য। যাহা সত্য, তাহা সত্যেরই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং সত্য যে তাঁহার প্রিয়, সত্য যে তাঁহার অঙ্গীভূত, অর্থাৎ সত্য যে তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? সেই জন্যই শাস্ত্রে 'মন্ত্র-ব্রহ্ম' বাণী বিঘোষিত দেখি।

* * *

মন্ত্রও যে বস্তু, ব্রহ্মও সেই বস্তু। কেন-না, মন্ত্রদ্বারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আবার ব্রহ্ম হইতেই মন্ত্র নিঃসৃত হয়। আমার নাম কি—আমি যদি তোমায় বলিয়া দিই, আর তুমি যদি আমার সেই নামে আমায় আহ্বান কর, আমায় নিশ্চয়ই তোমার আহ্বানে কর্ণপাত করিতে হইবে। আমাকে আহ্বান-পক্ষে আমার নাম-রূপ সঙ্কেত

যেমন কার্য্যকরী হয়, ভগবানের সান্নিধ্য-লাভ-পক্ষেও তাঁহার মন্ত্র-রূপ সঙ্কেত সেইরূপ সুফল প্রদান করে।

* * *

"অস্ত সূনৃতা" পদদ্বয়ে তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বা তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত সত্যস্বরূপ বাক্যই বুঝাইতেছে। তার পর, সে 'বাক্' (বাক্য) কেমন, বিভিন্ন বিশেষণ তাহা ব্যক্ত হইতেছে। উহা 'বিরপ্শী'—বিবিধ উপচারবতী বা বৈচিত্র্যবিশিষ্টা; 'মহী' অর্থাৎ মহতী শ্রেষ্ঠা সুস্পষ্টবাদিনী বা অর্চ্চনীয়া; 'এবং গোমতী' অর্থাৎ জ্ঞানদায়িনী। এক একটি বিশেষণই সে বাণীর সার্থকতা বিজ্ঞাপিত করিতেছে৭

* * *

স্বহস্তে বৃক্ষ রোপণ করিয়া মানুষ যখন সেই বৃক্ষের শাখায় সুপক্ব ফলসমূহ দোদুল্যমান দেখিতে পায়, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এ উপমায় কি সরল সুন্দর ভাবেই নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত হইয়াছে! সেই পবিত্র বিচিত্র জ্ঞানপ্রদ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, যাজ্ঞিক যখন সে মন্ত্র সার্থক প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহার প্রাণে কি অনুপম আনন্দেরই সঞ্চার হয়! অন্যপক্ষে, "পক্বা শাখা ন" এই উপমায় আর এক মহৎ ভাব উপলব্ধ হইতে পারে। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্যে বা মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধক যখন তন্ময়ত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া ভগবানও পরম আনন্দিত হন। স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষে সুপক্ব ফল দোদুল্যমান দেখিলে, বৃক্ষ রোপণ করিয়া রোপণকারীর যে আনন্দ, আনন্দময়েও তখন সেই আনন্দের উৎস উচ্ছ্বসিত হয়—মনে করিতে পারি। তাহাতে, আনন্দ-বিভোর সাধক, সর্ব্বানন্দময়ের সংশ্রব-লাভে সমর্থ হইয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হন।

* * *

মন্ত্র বলিতেছেন,—'ভগবৎ-বাক্য-রূপ সত্যমন্ত্র গ্রহণ কর। তদনুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও; হৃদয়-বৃক্ষে জ্ঞান-রূপ পক্বফল স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখিবে,—চিদানন্দে মগ্ন হইবে।' ফলতঃ, বিধিপূর্ব্বক বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে যে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, এই মন্ত্র তাহাই দ্যোতনা করিতেছে।

—•—

জ্ঞান-বেদ।

অহং সো অস্মি যঃ পুরা সুতে বদামি কানি চিৎ।

তং মা ব্যন্ত্যাধ্যো বৃকো ন তৃষ্ণজং মৃগং

বিত্তং মে অস্য রোদসী॥

বিভ্রান্ত আমরা! আমাদিগের সকল কর্ম্মেই বিভ্রান্তি! বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া, আমরা সদসৎ ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছি; সার সত্যের অনুসরণে আমাদিগের আর প্রবৃত্তি জন্মে না। পিপাসার্ত্ত মৃগ যেমন জল-ভ্রমে মরীচিকায় মুগ্ধ হয়; আমরাও সেইরূপ, বিভ্রান্তির মোহে ভুলিয়া, ঐহিক সুখের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, মৃত্যুকে নিরন্তর আলিঙ্গন করিতেছি।

কিন্তু এ বিভ্রম কোথা হইতে আসিল? কোন্ কর্ম্মের ফলে আমরা এমন বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম? এ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা আমাদিগের আদৌ নাই। আমরা কেবল বাসনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। বাসনা-নদীর খরস্রোত আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যাইতেছে, আমরা সেই দিকেই প্রধাবিত হইতেছি। আমরা সুখের জন্য অস্থির; সুখের আশার

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। তৃষিত মৃগ যেমন জলাশয়ের উদ্দেশে ধাবমান হইয়া পথিমধ্যে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয়; আমরাও সেইরূপ ঐহিক সুখের লালসায় প্রলুব্ধ হইয়া রিপুকবলগত হইতেছি। কিন্তু ঐহিক সুখ যে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রভ, ঐহিক সুখের পরিণাম যে চির অশান্তি, আমরা সে কথা একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখি না। রিপুর প্রভাবে আমরা কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলি। রিপুকে শাসন করিবার পরিবর্ত্তে আমরাই রিপুগণ কর্ত্তৃক শাসিত হই।

* * *

একদিকে এই বিভ্রান্তি, অন্যদিকে আবার সকল বিষয়েই আমাদিগের পল্লবগ্রাহিতা! এই দুই কারণেই আমরা ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হইয়া আছি। শীর্ষোদ্ধৃত বেদ-মন্ত্র এই তত্ত্বই আমাদিগকে অবগত করাইতেছেন। মন্ত্রটিতে আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোদ্বোধনা ও প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের ভাব এই যে—'যদিও আমি ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, তথাপি তৃষ্ণামূলক কর্ম্ম আমার দুঃখের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। হে দেবগণ! আমার দুঃখমূলক সেই তৃষ্ণাকে আপনারা দূর করিয়া দিউন। সত্য বটে, আমি সেই অনাদি অদ্বিতীয় বিশ্বস্রষ্টা মহান্ পুরুষ পরমব্রহ্মের অংশ; কিন্তু আমার অজ্ঞানতা এবং তৃষ্ণামূলক কর্ম্মই আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে,—আমাকে তাঁহা হইতে দূরে ফেলিয়াছে। পরন্তু যে কর্ম্ম ভগবৎ-প্রাপ্তির মূল, তাহাতে আমি বিরত আছি।'

* * *

উৎপত্তি-স্থান উৎকৃষ্ট হইলেও, উৎপন্ন বস্তু তজ্জাতীয় হইলেও, কলুষ-সংযোগে তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে। দুগ্ধ—অমৃততুল্য। কিন্তু অম্লসংযোগে

---

* মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা আমাদিগের "ঋগ্বেদ-সংহিতায়" দেখুন। তাহার বঙ্গানুবাদ,—"সেই ব্রহ্ম (দেবতা) নিত্যকাল বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মে বিদ্যমান আছেন; প্রার্থনাকারী আমিও সেই ব্রহ্ম (দেবতা) হই; কিন্তু কোন্ কর্ম্মসকলকে নির্দ্দেশ করিব—যে কর্ম্মফলে তাদৃশ ব্রহ্ম অঙ্গীভূত আমাকে, ব্যাঘ্র যেমন পিপাসিত মৃগকে পথে পাইয়া আক্রমণ করে সেইরূপ, দুঃখনিবহ বিদারণ করিতেছে। (ভাব এই যে,—যদিও আমি ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, কিন্তু তৃষ্ণামূলক কর্ম্ম আমার দুঃখহেতুভূত হইয়াছে); হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! আমার দুঃখমূলক তৃষ্ণা দূর হউক।)"।

বিকৃত হয়;—গোরোচনা সংশ্লিষ্ট হইলে নষ্ট হইয়া যায়। আম্রফল উপাদেয় বটে; কিন্তু কীট-প্রবেশে অথবা পচন-সংযোগে, তাহা একেবারে উপাদেয়ত্ব-ভ্রষ্ট অব্যবহার্য্য হয়। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে করিতে হইবে। আমরা সত্ত্ব-স্বরূপ সেই ব্রহ্মের অংশ বটে; কিন্তু কর্ম্মদোষে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছি;—তাঁহা হইতে দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হওয়ায়, অপকর্ম্মের পর অপকর্ম্মে প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করায়, এখন আর আমাদিগের ব্রহ্ম-সম্বন্ধত্বের পরিচয় দিবার কিছুই নাই। এ অবস্থায় এখন আর, দেবতার করুণা-প্রার্থনা ভিন্ন, দেবতার কৃপা-প্রাপ্তি ভিন্ন, হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষণ ভিন্ন, গত্যন্তর দেখা যায় না।

* * *

এইরূপ আত্মোদ্বোধ হওয়ায়, বেদ-মন্ত্রে তাই যেন প্রার্থনা জানান হইতেছে;—'হে দেবগণ! আমার কর্ম্মপদ্ধতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিউন;—রিপুগণের কবল হইতে আমাকে মুক্ত করুন; আমি যে সেই পরব্রহ্মেরই অংশ, আমি যে সেই পূর্ণমঙ্গলময়েরই অঙ্গীভূত, এ কথা আমি যেন ভুলিয়া না যাই; পরন্তু কি প্রকারে তাঁহাতে লীন হইতে পারি, কি প্রকারে স্বরূপ হইয়া স্বরূপে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই,—এ জ্ঞান যেন আমাতে উপজিত হয়।'

* *

এ পক্ষে প্রধান প্রয়োজন—আত্মতত্ত্ব-অনুস্মরণ। কে আমি? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায়ই বা চলিয়াছি? এই চিন্তা সর্ব্বদা মানুষের মনে জাগরূক হউক। মন্ত্র সেই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে—জাগরণই—পূর্ব্বস্মৃতির অনুধ্যানে তৎপথানুবর্ত্তী হওয়ার প্রয়াসই—উন্নতির সোপান। যদি উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে চাও, আত্মবিস্মৃতি পরিহার কর; মনে প্রাণে ধারণা কর,—"অহং সো অস্মি।"

—•—

জ্ঞান-বেদ।

—:৺ * ৺:—

১ ২ ৩ ১ ৩ ২উ ৩ ১ ২
বস্যাঙ্৺ ইন্দ্রাসি মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মাতা চ মে ছদয়থঃ সমা বসো বসুত্বনায় রাধসে॥

* . *

'কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সবলের তিনি॥'

ঈশ্বরই জগতের একমাত্র প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা। তিনিই জগতের পিতামাতা; তাঁহা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; তাঁহারই কৃপায় জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তিনি মাতার মাতা, পিতার পিতা, জাগতিক সকল বন্ধুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। তাঁহার অপার প্রেমের কণামাত্র পাইয়া মানুষ প্রেমিক হয়, তাঁহার শক্তির বিন্দুমাত্রের অধিকারী হইতে পারিলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

* . *

পার্থিব মাতাপিতা মানুষকে জন্ম দিয়া লালন পালন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন; তাঁহাদের ইহার অধিক কিছু করিবার শক্তিও নাই। কিন্তু জগতের পিতা যিনি, সমস্ত বিশ্ব যাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়, কেবলমাত্র তিনিই মানুষকে তাহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপযোগী শক্তি প্রদান

করিতে পারেন। মানুষ, মাতাপিতার বন্ধুবান্ধবের স্নেহ-ভালবাসা পাইয়া, তাঁহারই প্রেমের ছায়া তাহাতে দেখিতে পায় সত্য; কিন্তু এই জাগতিক প্রেম তাহাকে তাহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। বরং মানুষ অজ্ঞানতা ও মোহদ্বারা আবদ্ধ হইয়া আপনার চরম লক্ষ্য ভুলিয়া যায়—তাহার আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায়। কেবলমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানই মানুষকে তাহার গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন,—সেই পথে চলিবার শক্তি দিতে পারেন।

* * *

তত্ত্বদর্শী সাধক, মায়ার সংসার মোহের আগার পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরম-ধনের সন্ধানে বাহির হইয়া যান। তাই রাজত্ব, পার্থিব সম্পৎ, পিতা-মাতার স্নেহ, প্রেমময়ী পত্নী গোপার প্রেম—বুদ্ধদেবকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি এমন ধনের, এমন প্রেমের সন্ধানে বাহির হইলেন,—যে ধন যে প্রেম মানুষকে প্রচুর সুখ-শান্তি দিতে পারে;—যে প্রেম পাইলে বিশ্ব আপন হইয়া যায়। অনিত্য-সংসারের এই অনিত্য প্রেম, ধন-সম্পৎ মান-যশ, আত্মীয়-স্বজন, তত্ত্বদর্শীকে মুগ্ধ করিতে পারে না। এই বন্ধুবান্ধবের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া, তিনি এমন বন্ধুর—এমন আপনজনের সন্ধানে বাহির হয়েন, যে আপনজন অনন্তকাল ধরিয়া আপনার অনন্ত অফুরন্ত প্রেমামৃত মানুষকে পান করাইতেছেন। তিনি কি আর অন্যতে তৃপ্ত হন? "বিন্দুতে কে তৃপ্ত হবে, সিন্ধু যদি মিলে?"

* *

কিন্তু, সেই আপনজনকে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নয়—যদি সেই অনন্ত প্রেমময় আপনি আসিয়া না ধরা দেন। সেই আপন-জনকে খুঁজিতে গিয়া সাধক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—

"আপন চিনা কঠিন ভবে,
আপন চিনবে যেদিন, বিশ্ব সেদিন, আপন হয়ে যাবে।
চিনিলে আপনজনা, হয়ে যেতে খাঁটী সোণা
পেতে তাঁর প্রেমের কণা—ভেসে যেতে কবে!"

সে ত আর বিন্দু নয়, সে যে অপার সিন্ধু! তাঁহার সঙ্গে কি পার্থিব পিতা-মাতার বা ভ্রাতাবন্ধুর তুলনা হয়? তাই বলা হইতেছে—'বন্ধাৎ ইন্দ্রাসি

মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ।' তাই, ইঙ্গিত করা হইয়াছে—'মানুষ! এমন জনকে ভালবাস, এমন জনের উপর রক্ষা ও পালনের জন্য নির্ভর কর, য়িনি অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি।' সাধক গাহিতেছেন—"মন! ভালবাসতে যদি হয়, তাঁরেই শুধু ভালবাস যে জন প্রেমময়।"

* * *

এমন প্রেমময় দয়াময় যিনি, তাঁহার নিকটে মানুষ প্রার্থনা করিবে না ত কাহার নিকটে করিবে? তাই প্রার্থনা দেখিতে পাই,—'ছদয়থঃ বসো বসুত্বনায় রাধসে'। 'ওগো জ্ঞানময়, ওগো প্রেমময়! তোমার করুণাধারা আমাদিগের উপর বর্ষিত হউক। আমরা অজ্ঞান, আমাদিগকে জ্ঞান দাও—যেন তোমার চরণে পৌঁছিবার উপায় জানিতে পারি। আমরা দুর্ব্বল; আমাদিগকে এমন শক্তি দাও—যেন সকল বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া তোমার অভিমুখে চলিতে পারি। আমরা প্রেমহীন শুষ্ক হৃদয়; প্রেম দাও প্রভু—যেন তোমার প্রেম আস্বাদন করিতে পারি। প্রভো! মাতৃ-রূপে তুমি আমাদিগকে তোমার স্নেহশীতল-ক্রোড়ে আশ্রয় দাও, পিতৃ-রূপে তুমি আমাদিগকে পালন কর—রক্ষা কর; পাপ-সংস্পর্শে আসিলে শাসন কর; ভ্রাতৃ-রূপে সখা-রূপে মোহ-বিভ্রান্ত আমাদিগকে হাত ধরিয়া লইয়া যাও প্রভু।

* * *

মন্ত্রটী ঋগ্বেদে ও সামবেদে উভয়ত্র দৃষ্ট হয়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় মন্ত্রার্থ এইরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে;—

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'অভুঞ্জতঃ' (সুধাস্বাদাপ্রাপ্তস্য, সত্ত্বসম্বন্ধরহিতস্য ইত্যর্থঃ) 'মে' (মম) 'পিতুঃ' (জনকাৎ) 'উত' (তথা) 'ভ্রাতুঃ' (সহোদরাৎ) ত্বং 'বস্যাং' (অধিকতরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী) 'অসি' (ভবসি); 'বসো' (বাসয়িতঃ আশ্রয়প্রদাতঃ হে দেব) ত্বং 'চ' (তথা) 'মে' (মদীয়) 'মাতা' (জননী) 'সমা' (সমানঃ স্নেহশীলঃ সন্) 'বসুত্বনায়' (আবাসস্থানপ্রদায়, মোক্ষপ্রাপকায় ইত্যর্থঃ) 'রাধসে' (পরমার্থরূপায় ধনায়, পরাজ্ঞানায়) 'ছদয়থঃ' (মাং কৃপাং কুরু, মাং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); সর্ব্বেভ্যঃ লোকানাং অধিকতরঃ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ মাং কৃপাং করোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

—— • ——

জ্ঞান-বেদ।

—:✽ ✽ ✽:—

অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণং।

যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা ॥

* * *

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'অখণ্ড আশ্রয়দাতা (ক্ষয়রহিত রক্ষণশীল) হে ইন্দ্রদেব! সর্ব্ববিধ যজ্ঞকর্ম্মে আমরা আপনার উদ্দেশে অন্ন সমর্পণ করিতেছি (আপনার নিকট ভক্তিভরে প্রার্থনা জানাইতেছি); আপনি তাহা গ্রহণ করুন। প্রার্থনা,—আমরা যেন পৌরুষ-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই; অর্থাৎ, পুরুষার্থ-সাধন-ক্ষম প্রভূত শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই।'

* *

এ পক্ষে, এ মন্ত্র কামনা-মূলক। তবে এ কামনা—স্বতন্ত্র কামনা। এ কামনা—পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের কামনা নহে; এ কামনা—পুত্রকলত্রাদি-লাভের কামনা নহে; এ কামনা—ভোগ-লালসা-মূলক নহে; এ কামনা—বিত্ত-সম্পত্তির কামনা নহে; এ কামনা—ঐহিকসুখভোগ-লালসামূলক নহে। এ কামনায় সাংসারিক আবিলতা নাই; এ কামনা—ভোগ-লালসায় কলুষিত নহে; এ কামনায়—কলুষ-কলঙ্ক নাই। এ কামনার সহিত ভোগলিপ্সার, বিত্ত-সম্পত্তির বা ধনপুত্রাদির কোনই সংশ্রব নাই। তবে এ কামনা—কিরূপ কামনা? এ কামনা—আত্মায় আত্মসম্মিলনের কামনা;

এ কামনা—পরমাত্মায় আত্মলীন করিবার বাসনা; এ কামনা—পরা-গতি মুক্তিলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা; এ কামনা—সেই অম্লান কুসুমের মধুপান জন্য মনোমধুকরের প্রবল তৃষ্ণা।

• • •

সকলেরই লক্ষ্য সেই এক—অভিন্ন। মানুষ যাহা কিছু করে, সকলেরই উদ্দেশ্য—সেই দুঃখনিবৃত্তি, সেই সুখসাধন। কিন্তু কোথায়ও তাহার দুঃখের নিবৃত্তি আছে কি? তাহার কামনা-বাসনার সঙ্গে সঙ্গে, দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। নদীপ্রবাহ যেমন একটীর পর একটী, তার পর একটী—অনবরত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে; মহাসমুদ্রের তরঙ্গ যেমন একটীর পর একটী করিয়া, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে; পুরাতনের পর নূতন, নূতনের পর আবার নূতন—তাহার যেমন বিরাম দেখি না; সেইরূপ দুঃখের পর দুঃখ আসিয়া, কামনার পর কামনা আসিয়া, তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে না হইতেই নূতন দুঃখের নূতন নিষ্পেষণে সে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। সংসারে যেমন দুঃখের অন্ত নাই; সংসারীর তেমনি দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টারও পরিসীমা দেখি না। কামনা-বাসনাই সকল দুঃখের মূলীভূত, আশা-আকাঙ্ক্ষাই সকল দুঃখের আকর।

• • •

অনুভাবনাই দুঃখ। সেই দুঃখ-নিবৃত্তির বিবিধ উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ-নিবৃত্তি-বিষয়ে প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইলে, কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন,—"যথার্থ বলিতেছি, 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান যতক্ষণ তোমার থাকিবে, ততক্ষণ তুমি দুঃখ নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে না। যখন তোমার 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান বিদূরিত হইবে, তখনই তুমি দুঃখ-মুক্ত হইতে পারিবে।" সুতরাং অহঙ্কারই যে সকল দুঃখের হেতুভূত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা, যাহার অস্তিত্বাভাব, তাহা লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়াই দুঃখ। সে দুঃখের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা লাভ করা কিরূপে হইতে পারে? তাই মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনরপি কহিলেন,—"যথার্থই,

'আমি' ও 'আমার' বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; আছে কেবল—একমাত্র পরাৎপর শিব পরমাত্মা। সেই শান্তিময় আত্মা হইতেই এই প্রতিভাসিক দৃশ্য বস্তু। কিন্তু এই দৃশ্যের কোনও স্বরূপ নাই, ইহা অলীক। জগৎ-নামক এই যে দৃশ্য দেখা যাইতেছে, ফলে ইহা সুবর্ণের বলয়ের ন্যায়, শিবময় আত্মা হইতে পৃথক কোনও বস্তু নহে। ইহাকে পৃথকরূপে না জানাকেই সাধুগণ ইহার ক্ষয় বলিয়া থাকেন। ইহার ক্ষয় হইয়া গেলে একমাত্র সত্য সেই পরমব্রহ্মই থাকেন। বিল্বের অভ্যন্তরগত মজ্জা, অভ্যন্তরে যে বীজাদি উৎপাদন করে, সেই বীজাদি যেমন বিল্ব হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ চিৎস্বরূপ আত্মা আপনাতে যে চিত্ত নামক ত্রিপুটী রচনা করেন, সেই ত্রিপুটী তাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। ভূলোকের অন্তর্গত জম্বুদ্বীপাদি-বিভাগ যেমন ভূলোক হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ আকাশের অন্তর্গত পৃথিব্যাদি পদার্থও, পরমাত্মা হইতে অণুমাত্র পৃথক নহে। যেমন জল ও জলের অন্তর্গত দ্রবত্ব, পরস্পর অভিন্ন পদার্থ; সেইরূপ চিন্ময় ও চিত্ত একই পদার্থ; জলে যেমন দ্রব্যত্ব ও তেজে যেমন আলোক বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মেও চিদ্ভাব ও চিত্তভাব দুই-ই আছে। দৃশ্য প্রকাশ করাই চিতির কর্ম্ম; সেই কুটস্থ চৈতন্য হইতে ঐ দৃশ্য ভ্রমপ্রতীয়মান্ যক্ষের ন্যায় বৃথাই উদিত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা তাহা উদিত নহে। অতএব মনুষ্যের নিজের কোনও কর্ম্ম বা কর্তৃত্ব নাই, ইহা স্থির।" ে কেবল বিভ্রম মাত্র।

* * *

সুতরাং যতদিন অহঙ্কার থাকিবে, যতদিন অহং-জ্ঞানের তিরোভাব না হইবে, ততদিন দুঃখের নিবৃত্তি নাই। কূপমধ্যে সঞ্জাত হরিৎ তৃণের লালসায় ধাবমান হইয়া হরিণ যেমন কূপমধ্যে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তৃষ্ণার অনুসরণে অনুসরণকারী মূঢ় ব্যক্তিও সেইরূপ অন্ধতম নিরয়কূপে নিপতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। তৃষ্ণা বা বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা কামনা—অহঙ্কারেরই নামান্তর। সেই অহঙ্কারের ক্ষয় হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়; তখনই শ্রেয়োলাভে—সুখসাধনে সমর্থ হইতে পারা যায়। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—"অনহঙ্কারিণী কর্ত্তরী দ্বারা অহংজ্ঞানরূপিণী তৃষ্ণাকে ছেদন করিতে পারিলে, নিখিল-সংসারভয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে

সুখে অবস্থান করিতে পারা যায়।” কিন্তু এখানেও সংশয় উপস্থিত হয়। দেহ অহঙ্কারের আবাসভূত। অহঙ্কারের ক্ষয় হইলে দেহধারণ অসম্ভব হয়। যেমন জানুর ন্যায় সহিষ্ণু মূলভাগই বৃক্ষকে ধারণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ অহঙ্কারের অবলম্বনেই দেহ আছে। সুতরাং অহঙ্কারের ক্ষয় হইলেই অবশ্য দেহ থাকে না। শ্রীরামচন্দ্রের ঐ সংশয় নিরসন জন্য মহামুনি বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,—“হে রাজীবলোচন! তত্ত্বজ্ঞেরা বাসনা-ত্যাগকে সর্ব্বত্রই ‘জ্ঞেয়’ ও ‘ধ্যেয়’ এই দুই প্রকারে নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে আমি ইহাদের, ইহারা জীবন ও আমার, আমি ইহাদের সহিত পৃথক কেহই নহি; ইহারাও আমার ভিন্ন কিছু নহে;' এইরূপ নিশ্চয় তোমার মনে সতত রহিয়াছে; কিন্তু যখনই তুমি মনের সহিত বিচার করিয়া বুঝিবে যে, ‘আমি কাহারও নহি, আমারও কেহ নহে’ তখনই, এই চরম-জ্ঞান তোমার শীতল বুদ্ধিতে বিকাশ পাইলেই, তোমার ধ্যেয় অর্থাৎ চিন্তনীয় দ্বিতীয় বাসনা ত্যাগ হইয়াছে বুঝিবে; এবং সমগ্র জগৎকে ব্রহ্ম-স্বরূপে অবগত হইয়া জীব নিজ প্রারব্ধের ক্ষয়ে যখনই মমতাশূন্য হৃদয়ে দেহত্যাগ করে, তখনই তাহার জ্ঞেয়-সংজ্ঞক দ্বিতীয় বাসনা ক্ষয় সিদ্ধ হইল জানিবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারময়ী ও পূর্ব্বোক্তা ধ্যেয়বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। হে রঘুনাথ! যিনি ছলনাময়ী বাসনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করেন, তিনি জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী মুক্ত-পুরুষ বলিয়া অভিহিত। জনকাদি সুজন মহাজন মহাত্মারা অনায়াস-ব্যবহারে ধ্যেয়-বাসনা পরিত্যাগ করতঃ শান্তি পাইয়া পরমব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন। হে রাঘব! এই দ্বিবিধ বাসনাত্যাগীরাই জ্ঞানশালী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন।” সুতরাং বুঝা গেল,—বাসনাত্যাগেই মুক্তি।

* * * *

বাসনার ক্ষয় করিতে হইবে—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে সে বাসনা-ক্ষয় হইতে পারে? কর্ম্মের দ্বারা সেই বাসনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যিনি বাসনা বা তৃষ্ণা-বিরহিত হইয়া শ্রেয়ঃকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হন, তাঁহারই বাসনার ক্ষয় হইয়াছে;—তিনিই সুখলাভে সমর্থ হইয়াছেন। সেই শ্রেয়ঃকর্ম্ম কিরূপ? শাস্ত্রে কর্ম্মের বিবিধ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম, প্রবৃত্তকর্ম্ম

নিবৃত্তকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মের কতই পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। সেই সকলের মধ্যে সেই কর্ম্মই শ্রেয়ঃ কর্ম্ম, যাহাতে জগতের হিতসাধন হয়,—যাহাতে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করে। ভগবানের উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম;—সেই কর্ম্মই শ্রেয়ঃসাধক;—সেই কর্ম্মেই অহং-জ্ঞানের নাশ; সেই কর্ম্মেই দুঃখ-নিবৃত্তি;—সেই কর্ম্মেই সুখসাধন, সেই কর্ম্মেই কামনার নিবৃত্তি;—সেই কর্ম্মেই বাসনার অবসান।

* * *

মন্ত্রে সেই ভাবই পরিস্ফুট। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাবে যেন বলা হইতেছে,—'হে অক্ষয় ক্ষরণশীল ইন্দ্রদেব! আমরা সর্ব্ববিধ যাগে আপনার উদ্দেশ্যে অন্ন সমর্পণ করিতেছি; আপনি আমাদের পুরুষার্থ-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন।' ইহার মর্ম্ম কি? 'সর্ব্ববিধ যাগে আপনার উদ্দেশ্যে অন্ন সমর্পণ করিতেছি'—ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—'আমাদের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে আমাদের মনে যে কামনা-বাসনার উদয় হয়, যে অহংজ্ঞান জন্মে, সে সকলই, এমন কি কাম্য বস্তু পর্য্যন্ত, আপনার চরণে উৎসর্গ করিলাম। আপনি তাহা গ্রহণ করুন অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে আমাদের হৃদয়-কন্দর হইতে কামনা-বাসনা-রূপ শত্রুনিচয় বিদূরিত হউক,—আপনি তাহাদের সংহার-সাধন করুন। আমাদিগকে সেই ক্ষমতা প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হই।' কামনা-বাসনা-ত্যাগে আন্তরিক দুঃখ-নিবৃত্তির বিষয় এবং অহংজ্ঞানের অবসানে পরাগতি-লাভের প্রসঙ্গ এই মন্ত্রে সুপরিব্যক্ত। ভগবানের কর্ম্ম করিতে করিতে, কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিতে করিতে, যখন অহংজ্ঞানের লোপ হয়, তখনই পুরুষার্থ-সাধনের শক্তি আসে। তাঁহার অনুগ্রহে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব দৈববলের সঞ্চার হয়; কামনা-বাসনার মোহঘোর কাটিয়া যায়; রিপুশত্রুগণ পলায়ন করে। হৃদয় অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন মনোময়কে মনোরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার সামর্থ্য আসে। তখনই ঐকান্তিকতা জন্মে; তখনই তাঁহার প্রতি আনুরক্তি আসে। তখনই তাঁহাকে একৈকশরণা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—'তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর, সকল দুঃখের অবসান হইবে।

—— • ——

জ্ঞান-বেদ।

—:❀ * ❀:—

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।

দেবোদেবেভিরাগমৎ ॥

এই মন্ত্রে কয়েকটী অভিনব বিশেষণে অগ্নিদেবকে বিশেষিত করা হইয়াছে। অগ্নিদেবতাকে বলা হইয়াছে,—আপনি কবিক্রতু। এ শব্দ বহুভাবদ্যোতক। যাঁহারা আনুষ্ঠানিক যজ্ঞধর্ম্ম সমাধানে ব্রতী রহিয়াছেন, যজ্ঞকর্ম্মের উপযোগিতা প্রতিপাদানে যাঁহারা জনসাধারণকে যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী করিতে চাহেন, তাঁহারা উহার অর্থ একরূপ নিষ্পন্ন করিতে পারেন; আর যাঁহারা, অনুষ্ঠানের অতীত, সকল কর্ম্মের শেষভূত, জ্ঞানযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহার অন্য আর এক অর্থ সূচিত হয়। যাঁহারা লৌকিক যজ্ঞকেই সারভূত বলিয়া মনে করেন, 'কবিক্রতু' শব্দে তাঁহারা বুঝিতেছেন,—যজ্ঞনিষ্পাদনে অগ্নিদেবের ন্যায় কর্ম্মকুশল আর দ্বিতীয় নাই;—তিনি যজ্ঞকার্য্যের ক্রমবিজ্ঞানবিৎ, তিনি যজ্ঞকুণ্ডের ও স্বর্গলোকের সম্বন্ধ বিধান-পক্ষে প্রধান সহায়। তিনি যেন উভয় লোকের মধ্যস্থ-

স্থানীয়। যজ্ঞক্ষেত্র হইতে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া, তিনি যেন দেবগণ-সকাশে যাজ্ঞিকের কৃতকর্ম্মের বিষয় জ্ঞাপন করেন। আবার অন্য পক্ষে ঐ 'কবিক্রতু' শব্দে বুঝাইতেছে—তিনি জ্ঞানময়, তিনি প্রজ্ঞাস্বরূপ, তিনি ভূলোকে দ্যুলোকে—সর্ব্বলোকে জ্ঞানরূপে বিরাজমান আছেন।

* * *

কবি ও ক্রতু যে দুই শব্দের যোগে 'কবিক্রতুঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই দুই শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করিলে বুঝা যায়,—সর্ব্বজ্ঞতা হেতু তিনি ব্রহ্মা (কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভূ), আর সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বলিয়া তিনি বিষ্ণু। কবিক্রতু শব্দের যে কর্ম্মকুশল অর্থ নিষ্পন্ন হয়, সে কর্ম্ম—কোন্ কর্ম্ম? সে কর্ম্ম—ইন্দ্রিয়নিরোধ। 'ক্রতু' শব্দে—ইন্দ্রিয়কে বুঝায়। কবি শব্দে রশ্মি অর্থও সূচিত হয়। 'কবিক্রতু' বলিতে ইন্দ্রিয়-সংযমশীল অর্থও উপলব্ধ হইতে পারে। যেমন দুর্দ্দম অশ্বকে রশ্মির দ্বারা সংযত করা হয়, তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয়-সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মি দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখিতে পারেন, তিনিই কবিক্রতু। গীতায় শ্রীভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা সেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' অবস্থাই বুঝাইয়া থাকে। যিনি অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-তৃষ্ণা-অভিলাষ এককালে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার আদৌ নাই, যিনি আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্বরূপ আত্ম-সম্মিলনে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। আবার, আপনাকে আপনি জানিয়া যিনি আত্মময় হইয়া আছেন, তিনিই কবিক্রতু। শব্দ বিভিন্ন হইলেও বস্তুপক্ষে কোনই বিভিন্নতা নাই—উভয়ই সেই এক অবস্থা।

* * *

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি কবিক্রতু; মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি সত্য; মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি চিত্রশ্রবস্তমঃ অর্থাৎ অতিশয় কীর্ত্তিমন্ত। এ সকল বিশেষণের তাৎপর্য্য কি? শ্রীভগবান্—বিশেষণ-বিরহিত, আবার তাঁহার বিশেষণের অন্ত নাই। তিনি নির্গুণ—গুণাতীত, আবার তিনি সগুণ—গুণময়। তিনি সাকার, আবার তিনি নিরাকার, আবার তিনি একাকার। অসম্ভব সম্ভব—তাঁহাতে কিছুরই অসম্ভাব নাই। এরূপভাবে

পরস্পর বিরোধী বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার কি কোনও নিগূঢ় কারণ নাই? উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাকে সকল দিক্ দিয়া সকল ভাবে বুঝিতে হইবে। তাঁহাকে বলা হইল,—তিনি কবিক্রতু, তিনি সত্য, তিনি অশেষ কীর্ত্তিসম্পন্ন। কেন এতাদৃশ গুণ-বিশেষণে সেই বিশেষণের অতীত নির্গুণ বস্তুকে বিশেষিত করা হয়? উদ্দেশ্য—তোমাকে তৎসন্নিকর্ষে পৌঁছিতে হইবে, তোমাকে তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হইবে, তোমাকে তদ্গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। যাহার জন্মই নাই, তাহার আবার মৃত্যু হইবে কি প্রকারে? কর্ম্ম করিলে তো কর্ম্মের ত্যাগ করা সম্ভবপর হয়? যে কখনও কোনও কর্ম্মই করিল না, তাহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভবে? যে গুণের অধিকারী না হইল, সে কেমন করিয়া গুণাতীতে পৌঁছিতে পারিবে? আগে গুণের অধিকারী হও, তবে তো গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে? গুণ-বিশেষণ দেখিয়া, গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও; তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে? যে মূর্খ, যে জন পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে; পণ্ডিতের সন্নিধানে অবস্থিতি—পণ্ডিতগণের সহবাস-লাভ তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর কি? যে অসৎ, যে চৌর, সে কি সতের সন্নিকটে তিষ্ঠিতে পারে?

• • •

বিশেষণ দেখিয়া বিশেষণের অনুসারী হইতে হইবে। যে চিন্তা, যে ধ্যান, যে জ্ঞান লইয়া জীব, কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে; সে তদ্ভাবই প্রাপ্ত হয়। যে গুণকে আদর্শ করিয়া সেই গুণের অনুকরণ করা যায়, সেই গুণে গুণান্বিত হওয়াই প্রকৃতির বিধান-বৈচিত্র্য। চিন্তায়, ধ্যানে, অনুসরণে, জীব যে অনুস্মৃত ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের একটী দৃষ্টান্তে তাহা বিশদীকৃত দেখি। ভগবদ্বৈরিগণ, বৈরিভাবে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়াও, মুক্তি-লাভ করিয়াছিল। সেই বিষয় বুঝাইবার জন্যই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইতেছে,—

"এবং পূর্ব্বকৃতং যত্তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা॥"

অর্থাৎ,—'কীট যেমন, পেশস্কৃৎকে (কুমীরক পোকাকে) স্মরণ করিতে করিতে তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কৃষ্ণবৈরী রাজগণ, পূর্ব্বকৃত বৈরতাজনিত

পাপের বিদ্যমানতা-সত্ত্বেও অন্তকালে তদ্রূপ স্বারূপ্য-মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।' শ্রীভগবান্ তাই এ বিষয়ে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥"

অর্থাৎ,—'বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুসরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে।' জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, গুণময়ের যে গুণকথা গীত হইয়া থাকে, পরমপিতার পুণ্যস্মৃতি যে অনুসরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কি আছে? তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত, তৎস্বরূপে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

* * *

দুঃখের দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া সংসারের জ্বালামালায় জর্জ্জরিত থাকিয়া, মানুষ অহর্নিশ পরিত্রাহি ডাক ডাকিতেছে। কি প্রকারে এই দারুণ দুঃখের নিবৃত্তি হয়? কি প্রকারে এই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তির পূতধারা বর্ষিত হয়? সারা সংসার ব্যাপিয়া তাহারই সন্ধান চলিয়াছে। কোথায় মোক্ষ? কোথায় নিঃশ্রেয়স্? কোথায় মুক্তি? কি প্রকারে সে মুক্তি অধিগত হয়? সকলেই সেই সন্ধানে বিষম বিব্রত! কিন্তু কেহই সে তত্ত্ব সন্ধান করিয়া পাইতেছেন না। অথচ শাস্ত্র, ইঙ্গিতে সে তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বুঝাইয়াছেন,—মুক্তি পঞ্চ-বিধা;—"সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, স্বারূপ্য, সাযুজ্য (একত্ব)। সমান লোকে বাস করার নাম—সালোক্য-মুক্তি। সমানরূপ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হওয়ার নাম—সার্ষ্টি মুক্তি। সামীপ্য বা নৈকট্যজনিত যে মুক্তি, তাহারই নাম—সামীপ্য মুক্তি। সমান-রূপে রূপান্বিত হওয়ার নাম স্বারূপ্য মুক্তি। আর সাযুজ্য বা একত্বরূপ মুক্তিই অভেদ-ভাব। এই মুক্তিতে তিনিও সে, তুমিও সেই। এই পঞ্চবিধা মুক্তির এক এক বিভাগকে এক একটীর স্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে। সমান লোকে বাস করিবে? সমান গুণসম্পন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত হও। তিনি সত্য-স্বরূপ, তিনি ন্যায়স্বরূপ, তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁহার সমান গুণসম্পন্ন হইতে হইলে, তোমাকেও

ন্যায়-স্বরূপ, সত্য-স্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ হইতে হইবে। হও—সত্যপর, হও—ন্যায়পর, হও—জ্ঞানের অধিকারী! তবে তো তাঁহার সহিত সমান লোকে বাস করিতে পারিবে! তবে তো তাঁহার সহিত সমান ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইবে! তবে তো ক্রমে ক্রমে, সমান লোক সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার নৈকট্যলাভে সমর্থ হইবে! নৈকট্য হইলেই স্বরূপ অবগত হইবার অবসর আসে। স্বরূপ অবগত হইলেই রূপে রূপ মিশাইবার, আত্মায় আত্ম-সম্মিলন ঘটাইবার, প্রযত্ন হয়। রূপে রূপ মিশিলে, আত্মায় আত্মসম্মিলন হইলে, তখন আর ভেদভাব বিদ্যমান থাকে না। তখন সমুদ্রের জল নদীর জল এক হইয়া যায়। মন্ত্রে অগ্নিদেবকে ঐ সকলবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্যই এই যে, তোমরা সকল গুণে গুণান্বিত হও। তিনি যেমন চিত্রশ্রবস্তম, অর্থাৎ বিচিত্র কীর্ত্তিমান্, তুমিও সেইরূপ বিচিত্র কীর্ত্তিমান্ হও! তিনি যেমন দেবতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও দানাদি-গুণযুক্ত, তুমিও সেইরূপ আপন গুণে, দয়াধর্ম্মদানাদি-গুণ দ্বারা, সত্য-সরলতা-ন্যায়পরতা প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত হইয়া, স্বপ্রকাশ হও। এই শিক্ষাই সুষ্ঠু শিক্ষা।

* * *

এ মন্ত্রে আরও বলা হইয়াছে যে,—এই যজ্ঞে দেবগণের সহিত আপনি আগমন করুন। পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছিল,—দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করুন! এই মন্ত্রে বলা হইতেছে,—তাঁহাদিগকে লইয়া আপনি এই যজ্ঞে আসুন। সেই মন্ত্রের ও পূর্ব্বে মন্ত্রের সামঞ্জস্য-সাধনে বেশ উপলব্ধ হয়; যিনি বহুরূপে প্রতিভাত হন, যাঁহাকে বহু নামে পরিচিত করা যায়, যাঁহার বিষয় বহুভাবে ব্যক্ত হইতে থাকে, তিনি বহু হইলেও এক, এক হইলেও বহু। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"এক এব বহুস্যাম।" এখানে তাই বলা হইতেছে,—তুমি সকল রূপে এস, তোমার সঙ্গেই যেন সকল রূপ প্রকাশ পায়। অগ্নিরূপে জ্যোতীরূপে তোমার যে বিভূতি, সে বিভূতি প্রকাশ পাউক, আর, অন্যান্য দেবতারূপেও তোমার যে বিভূতি, আমার অন্তরে তাহাও প্রকাশ প্রাপ্ত হউক।

—— • ——

জ্ঞান-বেদ।

—:৵ * ৵:—

উপপ্রয়ন্তোঽধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে।

আরেঽঅস্মে চ শৃণ্বতে॥

* * *

ভগবান্ কত দিনে কবে আমাদিগকে পিতার স্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন? কত দিনে কবে আমরা আমাদিগের এই পতনের অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইব? এই—এই আকাঙ্ক্ষা—মানুষের মনে যখন জাগিয়া উঠে, তখনই মানুষ তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হয়। এই দেখুন—বেদ-মন্ত্র অনুসন্ধিৎসুদিগকে সেই সন্ধান—সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন। বেদ-মন্ত্র অনুস্মরণ করুন দেখি! ঐ শুনুন—বেদ আমাদিগকে কি কথা কেমন ভাবে বলিয়া যাইতেছেন! বেদ বলিতেছেন—

উপপ্রয়ন্তোঽধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরেঽঅস্মে চ শৃণ্বতে॥

* * *

সংসার-সমরে নিত্য-বিধ্বস্ত মানুষ, কেবলই হতাশে প্রমাদ-গণনা করিতেছে। পথ দেখিতে পাইতেছে না। উপায় কি হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। তাই ভয় পাইতেছে। মানুষের রুচি-প্রবৃত্তি-প্রকৃতি মানুষকে সহসা বুঝিতে দেয় না যে, ভগবান্ কেমন ভাবে কোথায় আছেন বা কি প্রকারে তিনি আমাদিগের প্রার্থনা শুনিতে পাইবেন। তিনি এই চর্ম্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান্ নহেন; সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বই অনেক সময় অঙ্গীকৃত হয় না। আমাদিগের প্রার্থনা যে তিনি

শুনিতে পান বা শুনিয়া থাকেন,—এ পক্ষে সে প্রসঙ্গ ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু, মন্ত্র বলিতেছেন,—'কে বলে—তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনিতে পান না? কৈ—একবার ডাকিয়া দেখ দেখি! বুঝিবে—নিশ্চয় তিনি সে ডাক শুনিতে পাইবেন।' তবে সে ডাকা—কেমন-ভাবে ডাকা, সে আহ্বান—কেমন আহ্বান, তাহার বিশেষত্বটুকু জানা আবশ্যক। তুমি সদা-কুকর্ম্মকারী কদাচারী; তুমি পরীক্ষার জন্য একবার তোমার ইচ্ছামত সম্ভাষণ করিলে; আর, তাহার কোনও প্রত্যুত্তর হয় তো পাইলে না! অমনই তোমার ধারণা হইল,—তিনি নাই অথবা তিনি কিছুই শুনিতে পান না। কিন্তু তাহা বলিলে তো চলিবে না! তিনি শুনিতে পান—এমন ভাবে কি তাঁহাকে ডাকিয়াছ? কৈ—কখনও তো না! হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পার—সে ভাব কিরূপ?

* * *

মন্ত্র তাহাই তো উপদেশ দিলেন! মন্ত্র কহিলেন,—'তোমার আহ্বান তিনি অবশ্যই শুনিবেন। কিন্তু সে পক্ষে, প্রথমতঃ তোমাকে সৎকর্ম্মশীল হইতে হইবে,—তোমাকে হিংসাপ্রত্যবায়াদিরহিত যজ্ঞের বা সৎকর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে হইবে; তার পর, পরিত্রাণকারক শব্দব্রহ্মরূপ বেদমন্ত্র উচ্চারণে তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইবে। আর, সে আহ্বানের লক্ষ্য থাকিবে—জ্ঞানলাভ—জ্ঞান-স্বরূপ তাঁহার সান্নিধ্য-প্রাপ্তি।' মন্ত্র বলিতেছেন—'তাহা হইলেই তোমার প্রার্থনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। তিনি দূরেই থাকুন, আর নিকটেই থাকুন—সে ভাবনা তোমার আর ভাবিবার আবশ্যক হইবে না। তোমার প্রার্থনা—তোমার মন্ত্র—তখন তিনি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন।' একবার এইভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া দেখ দেখি! তাঁহাকে ডাকিয়া তো সাড়া পাও না? দেখ দেখি—সাড়া পাওয়া যায় কি না! দেখ দেখি—তিনি তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তোমার সে প্রার্থনা পূরণ করেন কি না! দেখ দেখি—মন্ত্রের বাণী সফল হয় কি না! দেখ দেখি—কি মর্ম্ম কি উদ্বোধনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া কি জনহিত-সাধন-উদ্দেশ্যে মন্ত্র প্রকটিত আছে! মন্ত্র অনুধ্যান কর—মন্ত্রোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। দেখ দেখি—সাফল্য লাভ হয় কি না! দেখ দেখি—বিজয়শ্রীর অধিকারী হও কি না?

জ্ঞান-বেদ।

—❀ ❀ ❀—

৩ ২উ ৩ ১ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ১
বৃহদ্বয়ো হি ভানবেহর্চ্চা দেবায়াগ্নয়ে।
২ ৩ ১ ২র ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যং মিত্রং ন প্রশস্তয়ে মর্ত্তাসো দধিরে পুরঃ॥

মন স্বভাবতঃ নিতান্ত চঞ্চল; শরীরেন্দ্রিয়কে বিক্ষোভিত করিয়া তৎসমূহকে বিবশ করাই মনের প্রকৃতি। বহু দস্যু মিলিত হইয়া যেমন একজন পান্থকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ মনাদি ইন্দ্রিয়গণ অসহায় আত্মাকে প্রমথিত করিতে থাকে। বিষয়ভোগের বাসনা হইতে তাহাকে নির্ম্মুক্ত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হয় না। নিরন্তর অসংখ্য বিষয়-বাসনা পরিবৃত হইয়া মন যেন সর্ব্বদা নাগপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অরণ্যচারী মত্ত-মাতঙ্গের গতি যেমন কিছুতেই সংযত হয় না, অথবা বিমানচারী বায়ু যখন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার গতিরোধ করা যেমন অসম্ভব; সেইরূপ মনের গতি নিরোধ করাও দুঃসাধ্য।

জ্ঞানার্থী অর্জ্জুন তাই বড় ক্ষোভেই শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন,—'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব

সুদুষ্করং।” শ্রুতি বলিয়াছেন,—“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনো যুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।” অর্থাৎ, —আত্মাকে রথি-স্বরূপ, শরীরকে রথ-স্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথি-স্বরূপ, মনকে বল্গা-স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব-স্বরূপ জানিবে।' সুতরাং বিবেক-বিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত ও নিয়মিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা অতীব দুরূহ। অতি সূক্ষ্ম সূচীর দ্বারা যেমন লৌহকে সহসা ভেদ করা যায় না, তদ্রূপ বুদ্ধির দ্বারা মনকে ভেদ করা সহজসাধ্য নহে। তাই চিত্তবৃত্তিনিরোধের—মনকে সংযত করিবার—প্রকৃষ্ট পন্থা জানিবার জন্য অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

* * *

মন যে স্বভাবতঃ চঞ্চল, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ যে অতি সুকঠিন, শ্রীভগবানও তাহা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া গিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন,—'হৃদয় বশীভূত না হইলে, বাহেন্দ্রিয়ের নিরোধে কোনই সুফল-লাভ হয় না। যদি বলা যায়, দর্শনেন্দ্রিয়ই মনকে বিপথে পরিচালিত করে, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়ই মনকে বিপথে লইয়া যায়, কিন্তু এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ, লোভজনক পদার্থ দর্শন না করিলেই, অথবা প্রীতিজনক স্বর শ্রবণ না করিলেই যে মন সংযত হইল, তাহা নহে। মন যদি তৎসমুদায় উপভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে সৎসমুদায়ের নিরোধে কোনই ফললাভ হয় না।' সুতরাং কি উপায়ে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইতে পারে—কি প্রকারে মনকে জয় করিতে পারা যায়, তাহাই অনুধাবনার বিষয়। ভগবান তাহার পন্থা-প্রদর্শনে বলিলেন,—“অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।” অর্থাৎ, (একমাত্র) অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই মনকে নিরোধ করা যাইতে পারে।

* * *

অজ্ঞানতা—চাঞ্চল্যের মূলীভূত। বিষয়বাসনাদি ভোগলালসা—সেই অজ্ঞানতা হইতেই সমুৎপন্ন। অজ্ঞানতাই মনকে উন্মার্গগামী করে; অজ্ঞানতাই চিত্তবৃত্তি-সমূহকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিয়া থাকে। অজ্ঞান-মূল বিনষ্ট হইলে, চিত্তের সকল চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়,—মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদিত

হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞানতা কিরূপে দূরীভূত হয়? জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা নাশ হয়; জ্ঞানোদয়ে সদসৎ বিচার-শক্তি জন্মে; জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ের সকল আবিলতা বিদূরিত হইয়া থাকে; জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ে সদ্ভাব দেবভাবের সঞ্চার হয়। সদসৎ-বিচার-শক্তির পরিস্ফুরণে, চিত্তের নির্ম্মলতা জন্মিলে, চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়,—বিষয়-বাসনা ভোগাদিকামনা বিধ্বংস হইয়া থাকে। এই অবস্থাই বৈরাগ্য—এই অবস্থায়ই চিত্তবৃত্তিনিরোধ সম্ভবপর। সুতরাং এ পক্ষে জ্ঞানই যে প্রধান সহায়, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে, রজঃ ও তমঃ তিরোহিত হয়। তখন কেবল সত্ত্বগুণে হৃদয় অধিকার করে। সেই সত্ত্বগুণ-প্রভাবে হৃদয়-ক্ষেত্র স্বচ্ছ আলোকে উদ্ভাসিত হয়। সত্ত্বভাব—দেবভাব। যতক্ষণ সেই দেবভাব অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার না করে, ততক্ষণ মনের মলিনতা তিরোহিত হয় না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় না, মনের মলিনতা দূর না হইলেও সেইরূপ পরমেশ্বরের দর্শনলাভ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মনের মলিনতা, অন্তরের কলুষতা দূর করিয়া হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের আবশ্যক হয়। জ্ঞানাধিপতি ভিন্ন সে জ্ঞান অন্য আর কে প্রদান করিতে সমর্থ হয়? তিনি জ্ঞানাধিপতি; তিনি হৃদয়ে দেবভাবনিবহের জনয়িতা।

* * *

শার্য্যোদ্ধৃত বেদ-মন্ত্রে সাধক উদ্দাম মনকে সংযত করিবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন,—'হে মন! যদি পরমার্থলাভে অভিলাষী হইয়া থাক, তাহা হইলে ভক্তিসহকারে জ্ঞানদেবতার ভজনা কর। সেই জ্ঞানদেবতা নিখিল জগতের আরাধ্য। তিনি নেতৃস্থানীয়। তিনিই সকলকে ভগবানের নিকট উপস্থাপিত করিতে সমর্থ। তিনিই ভগবানকে আনয়ন করিয়া সাধকগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তিনি অশেষ দীপ্তিমান; তাঁহার দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত হয়। তাঁহার অধিষ্ঠানে সাধকগণ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইয়া থাকে। সুতরাং তুমি সেই জ্ঞানদেবতার অর্চ্চনা কর, অভ্যাসের দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠায় ও ঔৎকর্ষসাধনে প্রযত্নপর হও। তাহা হইলে তোমার পরাগতি লাভ হইবে। জগতের সকল পদার্থই তাঁহা হইতে

উদ্ভূব হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়! অনন্ত তিনি; তাই তিনি জন্মগতি-নিবারণ-সমর্থ। তাঁহাতে একবার আশ্রয় লইতে পারিলে, পুনঃপুনঃ গতাগতির সম্ভাবনা থাকে না। ফলে, জন্মকারণ নিবারিত হয়, জন্মগতি রোধ হয়।' যেখানে আশ্রয় লইলে আর অন্য আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ফিরিতে হয় না, যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে আর সংসার-বন্ধন-ভয়ে ভীত হইতে হয় না,—তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আর কি থাকিতে পারে? পথিক পথভ্রষ্ট—ঝড়ঝঞ্ঝাবাত্যানিপীড়নে নিপীড়িত। সে যদি একবার আশ্রয়ের সন্ধান পাইয়া আশ্রয় লাভ করিতে পারে, সহসা সে তাহা পরিত্যাগ করিতে চায় কি? সেইরূপ সংসার-অরণ্যে পথভ্রষ্ট পথিক আমরা। দুঃখদাবদাহে সদা দগ্ধীভূত হইতেছি। সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি,—কিসে সে দুঃখ নিবারিত হয়, কিসে জন্মজরামৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। এমন আশ্রয় স্থান আমাদের কি আছে,—যেখানে আশ্রয় লইলে সকল সন্তাপ সকল জ্বালা নিবারিত হয়! তখন যদি তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের সন্ধান পাই, তাহা হইলে সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি আসে কি? পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ আমাদের সেই আশ্রয়স্থল—যে আশ্রয়ে উপনীত হইতে পারিলে আর গতাগতির সম্ভাবনা থাকে না,—পরাগতি পরমানন্দ লাভ করিতে পারা যায়।

—•—

জ্ঞান-বেদ।

—:+*+:— —

ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।

অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥

* . *

মন্ত্রটী কি গভীর ভাবমূলক ; অথচ, কি কদর্থের আরোপেই তাহাকে কলুষিত করা হইয়াছে ! সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য ঋষিদিগের অঙ্গুলির দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে ; সেই পরিশ্রুত সংশোধিত মাদক-দ্রব্য ইন্দ্রদেবকে যেন পাইবার কামনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি আসিয়া মদ্যপান করুন,—ইহাই যেন এই মন্ত্রের একমাত্র প্রার্থনার বিষয়।'

* . *

এই মন্ত্রে একটী নূতন শব্দ—"অণ্বীভিঃ সুতাঃ।" তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—অঙ্গুলির দ্বারা সুসংস্কৃত। তদনুসারে ঋষিগণের বা ঋত্বিক-গণের অঙ্গুলির দ্বারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছে,—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। ভাব আসিয়া পড়িয়াছে,—সোমলতার রসের উপরে ফেণা পড়িয়াছিল ; ঋষিরা আঙ্গুল দিয়া তাহা সরাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন ! কিন্তু কত দুরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করা হয়,

তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময় আসে। 'অণু' শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' প্রত্যয়ে ঐ শব্দ সিদ্ধ। তাহারই তৃতীয়ার বহুবচনে "অণ্বীভিঃ' ('অণ্বী' হইতে) নিষ্পন্ন করা হয়। অঙ্গুলির সূক্ষ্মতা আছে বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গান্ত ঐ শব্দ অঙ্গুলি অর্থ সূচনা করে। অর্থও তদনুসারে হইয়া আসিতেছে! কিন্তু যদি 'অণু' শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক মুখ্য অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সেই মুখ্য অর্থের অনুসরণে, আমরা তাই 'অণ্বীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অণুপরমাণুরূপৈঃ' পদ গ্রহণ করি। "সুতাঃ' পদ দেখিয়া 'সুসংস্কৃত সোম বা মাদক-দ্রব্য' অর্থও গ্রহণ করা হয় না। পরন্তু এস্থলে যুগপৎ বিজ্ঞানসম্মত এবং আধ্যাত্মিক-ভাবযুত অতি-উপযোগী দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

* * *

প্রথমতঃ, এখানে বারিবর্ষণে ধরণীর শৈত্যসম্পাদনের ও স্নিগ্ধতাসঞ্চারের ভাব উপলব্ধ হয়। মনে হয়,—বিচিত্র-জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিতে সংসারের ক্লেদরাশি দগ্ধীভূত হইয়া সূক্ষ্ম-বাষ্পরূপে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করিতেছে। ইন্দ্র—মেঘাধিপতি। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সমল বিমল সর্ব্ব-প্রকার জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে অণু-পরমাণু-ক্রমে অভিনব-রূপ ধারণ করিয়া মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সেই অবস্থার বর্ণনা আছে,—মনে করা যাইতে পারে। "অণ্বীভিঃ সুতাঃ" তোমাকে পাইবার কামনা করিতেছে; অর্থাৎ পার্থিব জলরাশি—নদী-হ্রদ-তড়াগাদি—তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদের স্থূল দেহ, তোমার নিকট পৌঁছিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমার সহিত মিলিবার উদ্দেশ্যে ধাবমান হইয়াছে। তাহাদের সেই একাগ্রতার ফলে, তুমি বারি-রূপে বিগলিত হইয়া তাহাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছ,—তাহাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছ। মনে হয়, সারা সংসার—প্রকৃতির প্রতি সামগ্রী—অণুরূপে তোমার চরণে মিলিবার জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

* * *

মানুষ কি তাহা পারে না? আমরা কি সেরূপভাবে, হে ভগবন্, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না? জন্ম-জরা-মরণ-ধ্বংসশীল এই পার্থিব দেহ—পাপপঙ্কপূর্ণ মায়াময় এই মিথ্যার দেহ—তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরেই চিরনিমগ্ন রহিবে? এই মন্ত্র সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,—"তোমাতেও তো সোমসুধা সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান্ রহিয়াছে! স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে; স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তোমার হৃদয়, তোমার অন্তর, তোমার চিত্ত—তাহারা তো কখনই স্থূল নহে! তাহারাই তো তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি! পবিত্র হইলে, তাহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে? সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তোমার অন্তর—সে কেন ভগবচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হয় না! তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসার-পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে?—সে কেন তচ্চরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না! শরণ লও—তাঁহার! আশ্রয় কর—তাঁহার চরণ-পদ্ম! মত্ত হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে! তবেই সুসংস্কৃত সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে—এই বাক্যের সার্থকতা হইবে। তবেই তো সোমপানেচ্ছা বলবতী হইবে—তাঁহার। তবেই তো দ্রবীভূত মেঘরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি? তবেই তো মনোবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মল করিয়া, অণুপরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে তুমি! তবেই তো পরাগতি লাভ হইবে—তোমার!

—•—

জ্ঞান-বেদ।

—:ঃ*ঃ:—

১২ ৩২ ৩১২৩ ১২ ৩ ১২
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্।

২৩ ২ ৩২৩ ১২
অধ ত্যং তুর্ব্বশং যদুম্॥

মানুষ যখন পার্থিব সাহায্য-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া, তাহা লাভ করিবার অথবা তৎসাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়, তখনই সে উপায়ান্তর অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। কিন্তু হৃদয়ে যদি সত্যসত্যই অনুসন্ধিৎসা থাকে, তাহা হইলে সে সহজেই জানিতে পারে যে, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত মানুষের প্রকৃত বন্ধু অন্য কেহ নাই। তিনি মানুষকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করিতে পারেন, তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারেন! মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তৎসমস্তই সে ভগবানের নিকট হইতে পাইতে পারে;—কেবল তাঁহার নিকট চাহিবার মত চাহিতে হয়। মানব! তুমি রিপুশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত; তাঁহার নিকট রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা কর; তিনি তোমার রিপুনাশ করিবেন। তুমি কাঙ্গাল দীন দরিদ্র; তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা কর; পরমধন প্রাপ্ত হইবে। তিনি যে অনন্ত কুবের-ভাণ্ডারের অধিপতি। যিনি সৌভাগ্যবশে সেই পরম পুরুষের শরণাগত হন, তাঁহার রিপুভয় থাকে না, তাঁহার কোনও আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকে না।

তাই ধ্রুব যখন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, বিমাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, মাতার নিকট আসিয়া সেই পরম দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন; তখন সেই মহীয়সী মহিলা রোগের প্রকৃত ঔষধ নিরূপণ করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি বৎস! দুঃখ করিও না। সামান্য পার্থিব রাজ্যসম্পৎ পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছ? তুমি সেই রাজাধিরাজ পরমদেবতার শরণ গ্রহণ কর; তিনি তোমাকে অপার্থিব রাজ্য-সম্পৎ প্রদান করিবেন—যে সম্পদের নিকট সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যও অতি-তুচ্ছ অতি-নগণ্য। তুমি সেই পরমপুরুষের শরণাপন্ন হও;—যাঁহার কটাক্ষে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হইতেছে, যাঁহার শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টি-প্রলয় সাধিত হইতেছে, তিনি তোমাকে এমন সাম্রাজ্য প্রদান করিবেন, যাহার নিকট পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যই হীনপ্রভ হইয়া যায়। তুমি তোমার পিতার ক্রোড়ে স্থান পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না; তুমি সেই পরমপিতার—জগৎপিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হও। দেখিবে,—তোমার কোনও দুঃখ থাকিবে না, তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। বৎস, পার্থিব সম্পৎ, পার্থিব সম্মান তো অতি তুচ্ছ—ক্ষণমাত্রস্থায়ী! তুমি যদি সেই সম্রাটের সম্রাট, পিতার পিতাকে ডাকিতে পার, তবেই তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। তবেই তোমার সকল অভীস্ট পূর্ণ হইবে।"

* * *

সেই মহীয়সী রমণীর বাণী সফল হইয়াছিল। জগৎপিতার ক্রোড়ে ধ্রুব স্থান লাভ করিয়াছিলেন,—যে স্থান পাইবার জন্য মুনীন্দ্রগণ চির-লালায়িত, যে স্থান রাজাধিরাজের স্বপ্নেরও আগোচর। পার্থিব সম্পৎ কামনা করিয়া ধ্রুব সাধনা আরম্ভ করিলেন; ভগবানের ধ্যানে ভগবদারাধনায় তন্ময় হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার সেবকের কাতর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আসিলেন, তাঁহার ভক্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ সম্পৎ চাও?' তখন ধ্রুবের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছে। তিনি কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কাচের সন্ধানে আসিয়া তিনি কাঞ্চন লাভ করিয়াছেন;—মাটি কাটিয়া কোহিনুর লাভ করিয়াছেন। মনে হইল, তাঁহার মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী ও আশীর্ব্বচন,—"তাঁহাকে ডাক, পরমস্থান

প্রাপ্ত হইবে,—যে স্থান তোমার পিতা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই!’ ধ্রুব বুঝিলেন—মায়ের আশীর্ব্বাদে, ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছেন, পরম সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। তাই বলিলেন,—“আমার তো আর চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই। যখন আপনার শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়াছি, তখন আমার চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই। আপনার শ্রীচরণই আমার একমাত্র সম্পৎ। আমি যেন আপনার ক্রোড় হইতে দূরে না যাই।”

* * *

ফলতঃ, যে কোনও কারণেই মানুষ ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা মঙ্গলপ্রসূ হইবেই। সৎকার্য্যের সাধনে মঙ্গল-লাভ বা কল্যাণ-লাভ ঘটিবে। যিনি অনন্ত মঙ্গলের আকর, যাঁহার ছায়াস্পর্শে জগৎ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণে আত্মনিবেদন করিলে মানুষ নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করে। কখনও তাহার অন্যথা হয় না। ভগবান্ নিজে তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন, নিজে তাহাকে হাতে ধরিয়া আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। এই সত্যটাই বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। * যাঁহারা সত্যকর্ম্মা, যাঁহারা ভগবদারাধনাপরায়ণ, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। ভগবান্ নিজে তাঁহাদের রিপুনাশ করেন, তাঁহাদিগকে পরম সম্পদের অধিকারী করেন। ভগবান্ তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানদিগকে প্রবল রিপুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের মুক্তির পথ সহজ সুগম করিয়া দেন!

* *

---

* কি প্রকারে মন্ত্রটীতে ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহার আভাস আছে। যথা,—

হে ভগবন্! ত্বং ‘ইত্থাদিত্যে’ (সত্যকর্ম্মণে) ‘দিবোদাসায়’ (ভগবদারাধনাপরায়ণায়, তস্য মুক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) ‘ত্যং’ (প্রসিদ্ধং) ‘শম্বরং’ (শত্রুপুরাণাং স্বামিনং, প্রবলরিপুং) ‘অধঃ’ (ততঃ, তথা) ‘দুর্ব্বসং বহুং পুরঃ’ (জ্ঞানভক্তিবিঘাতকানি পুরাণি, জ্ঞানভক্তিনাশকান্ রিপূন্ ইতি ভাবঃ) ‘সদ্য’ (ক্ষণাদেব, সদৈব) বিনাশয়সি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকানাং রিপুনাশং করোতি ইতি ভাবঃ॥

জ্ঞান-বেদ।

—ঃ*ঃ—

৩ ১র   ২র   ৩   ১ ২ ৩   ১ ২
ইম ইন্দ্রায় সুন্বিরে সোমাসো দধ্যাশিরঃ

১র   ২র   ৩ ২ ৩ ১ ২
তা৺ আ মদায় বজ্রহস্ত পীতয়ে হরিভ্যাং

৩ ২ ৩   ২
যাহোক আ॥

স্বর্ণ খনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু খনিমধ্যস্থিত স্বর্ণ মানুষের কাজে লাগে না—যে পর্য্যন্ত না সেই স্বর্ণ পরিষ্কৃত হয়। মানুষের হৃদয়ও খনিবিশেষে। ইহার মধ্যে বহু মূল্যবান বস্তু নিহিত আছে। একটী প্রবাদ-বাক্য আছে—'যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'। মানুষ ভগবানেরই ক্ষুদ্র সসীম প্রতিরূপ, মানুষই 'সীমার মাঝে অসীম'। তাহার হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তি কর্ম্ম-শক্তি সমস্তই আছে। প্রত্যেক কর্ম্মের, প্রত্যেক ভাবের বীজ মানুষের হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় নিহিত আছে। সেই ভাবকে উপযুক্ত সাধনার দ্বারা অঙ্কুরিত ও প্রবর্দ্ধিত করিতে পারিলেই মানুষ মোক্ষ-লাভ করিতে পারে। সেই সাধনায় প্রবর্ত্তিত হওয়া ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করা ভগবানের কৃপা-সাপেক্ষ। ভগবান্ যেমন মানুষের মধ্যের সদ্বৃত্তি-সমূহের বীজ দিয়াছেন, তেমনি তিনি বীজকে রক্ষাও করেন। আমাদিগের হৃদয়-নিহিত সদ্ভাবসমূহকে তিনি মলিনতা হইতে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আমাদিগের মোক্ষসাধনলাভের উপযোগী করেন। নদীতীরের বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণরেণু মিশ্রিত থাকে, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সেই বালুকারাশি হইতে স্বর্ণরেণুর উদ্ধার সাধন করিয়া ও তাহাকে পরিষ্কৃত সুসংস্কৃত করিয়া মানবের

ধনভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। ভগবান্ সেই বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক,—যিনি মানবের হৃদয়-সমুদ্রের সৈকতভূমিস্থিত স্বর্ণাদপি শ্রেষ্ঠ সদ্বৃত্তিরাজীর উদ্ধার সাধন করিয়া, তাহাদিগকে সুমার্জ্জিত করিয়া, মানবকে তাহার মোক্ষ-লাভের পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করেন।

* . *

তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—'ভগবন্! মানুষ-জন্ম, শ্রেষ্ঠ-জন্ম বলিয়া অভিহিত হয়। তোমার ছায়ায় নাকি মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে. মানুষ নাকি তোমার শ্রেষ্ঠধনের অমৃতের অধিকারী। এস প্রভু, যদি এমন দুর্লভ-জন্ম কৃপা করিয়া দিয়াছ, তবে তাহাকে সার্থক করিয়া তুল—তোমার অপার মহিমা আমাকে অনুভব করাইয়া দাও। তুমি আমাকে যে অপার্থিব সম্পৎ দিয়াছ, তাহার সদ্ব্যবহার করিবার শক্তি নাই। আমার হৃদয়স্থিত অমার্জ্জিত ভাবরাশিকে তুমি তোমার পূজার উপযোগিতা প্রদান কর। আমার সাধ্য কি যে, তোমার কৃপা ব্যতীত তাহা তোমার পূজায় ব্যবহার করিতে পারি। আমার হৃদয়ে তোমার যে আলোক-রশ্মি দিয়াছ, তাহাকে ঘন-কৃষ্ণ-তমসার আক্রমণ হইতে রক্ষা কর। চারিদিকের মোহ ও পাপের আবর্ত্তে পড়িয়া তোমার দেওয়া পরমধন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে; তাহাকে নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর। হৃদয় শুষ্ক কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রেমধারা সিঞ্চন কর, শুষ্ক হৃদয় সরল হইয়া উঠুক। জ্ঞান দাও প্রভু!—যেন তোমায় জানিতে পারি। প্রেমময় সর্ব্বরসাধার তুমি—আর আমি হৃদয়ে মরুভূমির সৃজন করিতেছি! তোমার রসধারা আমার কঠিন হৃদয়ে বর্ষিত হউক, আমি তোমাকে উপভোগ-জনিত পরমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া যাই। অনন্ত জ্ঞানময়, তোমার সন্তান কি অজ্ঞানতায় ডুবিয়া থাকিবে প্রভো! 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' তুমি; দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, শুষ্কচিত্তে বরিষ স্নেহ—এ পাপী অজ্ঞান ধন্য হইয়া যাউক।'

* . *

এই মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের সান্নিধ্যলাভের—হৃদয়ে তাঁহার অনুভূতিলাভের—ব্যাকুল কামনা আমরা দেখিতে পাই। সাধক চিরদিনই ভগবানের স্পর্শ প্রাণে পাইবার জন্য লালায়িত! জাগতিক কোনও সম্পদই তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। পার্থিব মান-যশ

ধনসম্পৎ তাহার নিকট বিষবৎ বোধ হয়। তিনি সেই অনন্ত অপার সম্পৎ-সাগরে ভাসিয়া যাইতে যান,—যে সাগরে ডুব দিলে মানুষ অমর হয়, অমৃত হয়। সেই সম্পৎ—হৃদয়ে ভগবানের স্পর্শ। এই সান্নিধ্য পাইবার জন্য সাধক সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা ইহার একটা উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই। সেই অনন্তপুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ আত্মহারা হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যমুনাকুলে উপস্থিত হইলেন। এখানে ভক্তের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। রাসেশ্বর অতিশয় বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা ভাল ত?" গোপীগণ এই অনাত্মীয়তাসূচক প্রশ্নে বিস্মিত ক্ষুব্ধ হইলেন। সে কি! যিনি প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতা, যাঁহার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে এই বাহ্য ভব্যতাসূচক প্রশ্ন! তারপর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে একে একে তাঁহাদের পার্থিব ধন মান যশ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার নিকটে আসিলে পার্থিব বিষয় সব জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যাইবে। গোপীগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তখন তাহাদিগকে বলিলেন—'ওহো! তোমরা ভাবিয়াছ—আমার নিকটে আসিলে বুঝি স্বর্গভোগ করিবে! না—তা হইবার নয়! এই কর্ম্মনাশা নদী স্পর্শ করিলে স্বর্গমর্ত্ত্যের বিষয়ে আগুন ধরিয়া উঠে। সে আশা ত্যাগ কর—এখনও সংসার আছে, সম্পৎ আছে, মান আছে, যশ আছে, পরিবার-পরিজন আছে—এখনও ফিরিয়া যাও।'

* * *

কিন্তু এই সব শুনিয়াও গোপীগণ কি সত্য সত্যই ফিরিয়া গেলেন? না। সাধক এই সব তুচ্ছ বস্তুর জন্য ঈশ্বর-সান্নিধ্য কামনা করেন না, কাঞ্চন ফেলিয়া তাঁহারা আঁচলে কাচ বাঁধেন না। তাঁহাদের উত্তর—'ওগো আমি ত সে সব সম্পৎ লাভের জন্য তোমাকে প্রার্থনা করি নাই! আমি চাই, আমার হৃদয়ে তোমার স্পর্শ। সেই পরমধনের জন্য সমস্ত ফেলিয়া তোমার চরণে ছুটিয়া আসিয়াছি।' তাই মন্ত্রে প্রার্থনা দেখিতে পাই,—'আ মদায় বজ্রহস্ত হরিভ্যাং যাহ্যোক আ।'

জ্ঞান-বেদ।

—:৺ * ৺:—

যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসা রিশাদসঃ।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥

• • • •

দেবগণ উগ্র, অথচ স্নেহপ্রবণ, তাঁহারা দয়ার্দ্র, অথচ কঠোরভাবাপন্ন। কারুণ্যের ও কাঠিন্যের, তীব্রতার ও কোমলতার,—সেখানে যেন এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহসংসারে পিতামাতায় যুগপৎ এইরূপ কোমল-কঠোর ভাব-সমাবেশ দেখি। তাই বুঝি, তাঁহারা সাক্ষাৎ দেবতা-রূপে পরিকল্পিত হন। পিতামাতা যেমন সন্তানের প্রতি স্বতঃস্নেহপরায়ণ, অথচ সন্তানের দুষ্কৃতিনিবারণে রুদ্রভাবাপন্ন হন; দেব-চরিত্রেও এখানে সেই আদর্শ পরিদৃশ্যমান্ দেখি। দেবতা—তোমার পিতামাতা। দেখ—পিতামাতা কত স্নেহ করেন! আবার বুঝিয়া দেখ—তাঁহারা কেন পীড়ন করেন! তুমি সুপথে চলিলে, তাঁহাদের আনন্দের অবধি থাকে না। তুমি বিপথগামী হইলে, তাঁহারা ক্ষোভে আত্মহারা হন, তোমাকে তাড়না করিতে আরম্ভ করেন। দেবতার করুণা ও ভর্ৎসনা বিষয়েও সেই ভাব মনে করিতে হইবে।

• • • •

পিতামাতা-রূপে আদর্শ হইয়া, দেবগণ সংসারে বিচরণ করিতেছেন। সমভাবে তাঁহাদের স্নেহ-করুণার অধিকারী হও, অপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া কদাচ তাঁহাদের বিরাগভাজন হইও না। সংসার-ক্ষেত্রে সাধনার ইহাই যেন প্রথম স্তর। জনক-জননীর প্রীতির আস্পদ হইয়া, সংযম-শিক্ষার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে শিখিয়া, তাঁহাদের অনুকম্পা-লাভ-রূপ আনন্দই—ভবিষ্য-জীবনের চিদানন্দ-লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

মরুদ্দেবগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত যে সকল বিশেষণ এই মন্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার এক একটী বিশেষণের বিষয় অনুধ্যান কর;—আর সংসারে আপনার বিচরণের পথে তাহার সার্থকতা বিচার করিয়া দেখ,—কতকটা শুভফল-লাভের আশা নিশ্চয়ই করিতে পারিবে।

* * *

মন্ত্রের একটু ভাব-পরিগ্রহ করিয়া দেখ দেখি! মন্ত্রে বলা হইয়াছে—মরুদ্দেবগণ কেমন? না—'শুভ্রাঃ।' ঐ শব্দের প্রতিবাক্য সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—'শোভমানাঃ।' আমরা লিখিয়াছি—'কলঙ্কপরিশূন্যাঃ, সৎ-স্বরূপাঃ।' "শুভ্রাঃ শ্বেতাঃ শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাঃ।" যিনি যেমন, তিনি তেমনটীই চাহেন। সংসারে দেখি, যিনি উচ্চ-স্তরে অবস্থিত, তিনি সেই স্তরেরই সান্নিধ্য-লাভ আশা করেন। উচ্চস্তরের জন, নিম্নস্তরে অবনমিত হইতে কদাচ ইচ্ছুক নহেন। এখানে সেই ভাব ধারণা করুন। বলা হইয়াছে—মরুদ্গণ শুভ্র—কলঙ্কপরিশূন্য, শুদ্ধভাব-সমন্বিত। সুতরাং তাঁহাদের মিলন, তদ্ভাবাপন্নের সহিতই সম্ভবপর হয়। যাহারা বিপরীতভাবাপন্ন, কলুষ-কলঙ্ক-পূর্ণ, পাপপরায়ণ, তাহাদের প্রতি মরুদ্দেবগণ 'ঘোরবর্পসঃ'—'উগ্ররূপ-ধরাঃ।' অর্থাৎ, পাপীর পক্ষে তাঁহারা কঠোর ত্রাসকারক। আবার, অন্য-পক্ষে, তাঁহারা 'সুক্ষত্রাসঃ'—ক্ষত্রজনোচিত সহায়স্বরূপ। ধর্ম্মের সংরক্ষণে এবং অধর্ম্মের অপসারণে ক্ষত্র-বীর্য্য যেমন শোভনবলসম্পন্ন, 'সুক্ষত্রাসঃ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। অর্থাৎ, সজ্জনের প্রতিপালন জন্য দেবগণের শক্তি সর্ব্বদা নিয়োজিত আছে। সজ্জনের সংরক্ষণ জন্য তাঁহাদের আর এক কার্য্য উল্লেখযোগ্য। সে কার্য্য—শত্রুনাশ—রিপুদমন।

* * *

চেষ্টা কর দেখি একবার—শুভ্র কলঙ্কপরিশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। চেষ্টা কর দেখি একবার—সেই উন্নত-স্তরে অধিরোহণের জন্য। চেষ্টা কর দেখি একবার—মনে প্রাণে সদ্ভাবাপন্ন হইবার জন্য। দেখিবে—দেবগণ তোমাদিগের সহায় হইয়াছেন। দেখিবে—তোমাদিগের রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত হইয়াছে। দেখিবে—পাপীর ত্রাসকারী সজ্জনপালক দেবতারা তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

— • —

জ্ঞান-বেদ।

——:॰:*:॰:——

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ২

ওঁ। সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ৭ ২ ৩ ২

স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

• • •

'পুরুষঃ' (ভগবান্) 'সহস্রশীর্ষাঃ' (অনন্তশিরভির্যুক্তঃ, অনন্তশক্তিশালী) 'সহস্রাক্ষঃ' (অনন্তচক্ষুঃসমন্বিতঃ, অনন্তজ্ঞানসম্পন্নঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'সহস্রপাৎ' (সর্ব্বত্রবিদ্যমানঃ, সর্ব্বব্যাপকঃ) ভবতি; 'সঃ' (স পুরুষঃ) 'ভূমিং' (ব্রহ্মাণ্ডং) 'সর্ব্বতঃ' (সর্ব্বভাবেন) 'আ' (সমন্তাৎ, সর্ব্বদিক্ষু) 'বৃত্বা' (পরিবেষ্ট্য) 'দশাঙ্গুলং' (অতিক্ষুদ্রং প্রদেশং তথা ব্রহ্মাণ্ডাৎ অতীতস্থানং ইত্যর্থঃ) 'অত্যতিষ্ঠৎ' (অতিক্রম্য বর্ত্ততে)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বাঃ বিশ্বঃ ভগবতঃ একাংশেন অবস্থিতঃ; স সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ।

• • •

এই মন্ত্রটী পুরুষ-সূক্তের প্রথম মন্ত্র। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—চারি বেদেই পুরুষ-সূক্ত আছে। তন্মধ্যে সামবেদ-সংহিতার পুরুষ-সূক্তের পাঁচটী মন্ত্র পর-পর প্রকাশ করিতেছি। ঐ পাঁচটী মন্ত্র সহ, ঋগ্বেদ-সংহিতার ষোলটী মন্ত্র এবং যজুর্ব্বেদ-সংহিতার বাইশটী মন্ত্র পুরুষসূক্তের অন্তর্গত। কিন্তু অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় অন্য তেত্রিশটী মন্ত্র পুরুষ-সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

• • •

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলিতে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত আছে। বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ কেমন ভাবে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, এই মন্ত্রে তাহাই বোধগম্য হইবে।

* * *

এই মন্ত্রের মধ্যে যে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার ছায়ার অনুকরণ করিয়া জগতের সকল দর্শন-শাস্ত্র ও ধর্ম্মবিজ্ঞান রচিত হইয়াছে। অনন্ত-রত্নাকর বেদজ্ঞানের ভাণ্ডারে যে সমুদয় রত্নরাজি আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, তাহাদের জ্যোতির কণামাত্র লইয়া সমগ্র জগৎ আলোকিত। ধাতুর মধ্যে যেমন ''রেডিয়াম', জ্ঞানভাণ্ডারে তেমনি বেদজ্ঞান। অথবা, জাগতিক কোনও বস্তুর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

* *

ভগবান্ সহস্রশীর্ষ। এটা অবশ্য রূপক। ভগবানের সত্যসত্যই এক সহস্র মস্তক নাই। উহা তাঁহার অনন্ত-শক্তির পরিচায়ক মাত্র। একজন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন—'ভগবান্ অনন্তস্বরূপ। জগতের যত প্রাণীর মস্তক আছে, সমস্তই তাঁহার মস্তক। দশ অঙ্গুলি ভূমির অর্থ—হৃদয়। তিনি বৃহৎ হইতে বৃহত্তম, আবার ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র। অতি সামান্য জীবের হৃদয়েও তিনি বর্ত্তমান আছেন।' আমরা মনে করি, এই ব্যাখ্যায় আংশিক সত্য মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্র ইহার অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবের দ্যোতনা করে।

* *

তিনি 'সহস্রচক্ষু'। সর্ব্বত্রব্যাপী তাঁহার দৃষ্টি। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, আদি অন্ত মধ্য, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সমস্তই তিনি দিব্যনেত্রে প্রতিমুহূর্ত্তে দর্শন করিতেছেন। জগৎ তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত। তিনি দেশ ও কালের উপরে। 'দেশ' ও 'কাল' * তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তাঁহার নিকট 'ভূত' নাই, 'ভবিষ্যৎ' নাই—একমাত্র অনন্ত 'নিত্য-বর্ত্তমান' আছে। সুতরাং সসীম জীবের পক্ষে যাহা ভূত বা ভবিষ্যৎ, তাহা তাঁহার অনন্তজ্ঞানে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং কাল তাঁহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। 'দেশ' তাঁহার সত্তার অংশ মাত্র; উহা

* দেশ ও কাল—পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায় Space ও Time.

তাঁহার অনন্ত সত্তাতে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার নিকট 'সামীপ্য' অথবা 'দূরত্ব' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনি 'দেশের' দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন নহেন। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিবে ও ঘটিতেছে, তাহা তাঁহার জ্ঞানে বর্ত্তমান আছে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে—তিনি 'সহস্রাক্ষঃ'—সহস্রচক্ষু।

* * *

তিনি 'সহস্রপাৎ'। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি সর্ব্বব্যাপক। শুধু সর্ব্বব্যাপক নহেন, এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মধ্যে অবস্থিত আছে এবং এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেও তিনি বৃহত্তর, মহত্তর। তিনি ব্রহ্মাণ্ড হইতে দশাঙ্গুলি অধিক ভূমি ব্যাপিয়া আছেন,—এ কথার অর্থ এই যে, তিনি শুধু ব্রহ্মাণ্ড মাত্র নহেন, তিনি তাহার অপেক্ষাও বৃহৎ ও বহু উচ্চে অবস্থিত। দশ দিকে—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম-অগ্নি-বায়ু-ঈশান-নৈঋৎ-ঊর্দ্ধ-অধঃ—এই দশ দিকে তিনি ভিন্ন অন্য আর কিছুই নাই। সর্ব্বেশ্বর তিনি—সর্ব্বরূপে সর্ব্বঘটে সর্ব্বত্রই তাঁহার বিদ্যমানতা—তিনি সর্ব্বব্যাপক হইয়া আছেন। তাই তিনি 'সহস্রপাৎ'।

* * *

ভগবান্ জগতে বর্ত্তমান আছেন এবং তিনি জগদতীতও বটেন। এই উপলক্ষে পাশ্চাত্য-দার্শনিকদিগের মধ্যে একটী মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। * পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মতে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত মতবাদ। এই মতবাদের পোষণকারী দার্শনিকগণ 'যুক্তিবাদী' বলিয়া অভিহিত হয়েন; এবং বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই মতবাদেরই অনুসরণ করেন। † এই দার্শনিক মতবাদের অনুযায়ী যে ধর্ম্মমত, তাহার নাম 'পেনেনথিজম্' ‡ অর্থাৎ ভগবান্ জগতেও আছেন, তিনি জগদতীতও বটেন। এই ধর্ম্মমতই জগতের বর্ত্তমান ধর্ম্মবিজ্ঞানবিৎ 'থিয়োলজিয়ান্' § পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেন। সুতরাং আমরা

---

* এই মন্ত্রে এই যে দার্শনিকমতবাদের জন্ম দিয়াছে, তাহাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ Trancendent-immanent Theory বলেন।

† পাশ্চাত্যের Rational School of Philosophy এই মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

‡ Panentheism. § Theologians.

দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জগতে যে সকল দার্শনিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার কোনটীই ভারতীয় সভ্যতাকে অতিক্রম করিয়া তো যাইতে পারেই নাই, অধিকন্তু সেই সকল সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

* • *

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—অনেকে এমনই কুসংস্কারান্ধ যে, তাঁহারা এমন অত্যুজ্জ্বল রত্নও দেখিতে পান না। তাই বেদকে নিছক 'চাষার গান' বলিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন নাই। শুধু তাই নয়, বেদের এই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও তাঁহারা করিয়াছেন। এই দলে আমাদিগের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত লোকও আছেন! কেহ কেহ বেদজ্ঞানকে 'পেন্থেইজম' অর্থাৎ ভগবান্ বিশ্বেই পর্য্যবসিত, বিশ্বাতীত তাঁহার কোনও সত্তা নাই বলিয়াছেন। চোখে রঙ্গিন চশমা পরিলে সমস্তই রঙিন দেখায়। সুতরাং তাঁহারা যে আপন আপন ইচ্ছানুরূপ মতবাদ বেদের মধ্যে দেখিতে পাইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত (প্রফেসার ম্যাক্সমূলার) এই সকল হীন-চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদে যে ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহা 'পেন্থেইজম' * নয়, তাহা 'পেনেন্‌থিজম'† —ধর্ম্ম-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান, সভ্যতা ও চিন্তাধারার উপর বেদ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং বেদজ্ঞানই যে জগতের যাবতীয় জ্ঞানের জনক, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই এত আলোচনা করিতে হইল। বর্ত্তমান জগৎ ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ লিখিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই, বেদ একটী মন্ত্রের মধ্যে কেমন সুন্দরভাবে তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। দেখুন—বুঝুন—হৃদয়ে হৃদয়ে ধারণা করুন।

---

* Pantheism. † Panentheism.

জ্ঞান-বেদ।

——:※※※:——

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
২ ৩ ২৩ক ২র ৩ ২ ৩ ২
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ অশনানশনে অভি॥

* * *

পুরুষঃ' (ভগবান্) 'ত্রিপাৎ উর্দ্ধঃ' (ত্রিগুণং অতিক্রম্য, ত্রিগুণাতীতঃ সন্) 'উদৈৎ' (তিষ্ঠতি, বর্ত্ততে); 'পুনঃ' (অপিচ) 'অস্য' (তস্য, ভগবতঃ) 'পাদঃ' (অংশঃ) 'ইহ' (জগতি, ত্রিগুণাত্মকে জগতি ইত্যর্থঃ) 'অভবৎ' (বর্ত্ততে); 'ততঃ' (চ) সঃ 'অশনানশনে' (অশনং তথা অনশনং, ভোজনাদিব্যাপারযুক্তং সচেতনং তথা তদ্রহিতং অচেতনং, সর্ব্বং দৃষ্টবস্তুং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, অধিকৃত্য) 'বিষ্বঙ্' (সর্ব্বং বিশ্বং) '[illegible]' (ব্যাপ্নোতি, ব্যাপ্য তিষ্ঠতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎসত্তা বিশ্বে অনুস্যূতা ভবতি, অপিচ ভগবান্ বিশ্বং অতিক্রম্য অপি বর্ত্ততে—ইতি ভাবঃ।

* * *

এই মন্ত্রটী—পুরুষ-সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র। এই মন্ত্রও অন্য বেদে পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান্ কি ভাবে কোথায় বিদ্যমান আছেন, এই মন্ত্রে তাহারই একটা আভাস পাওয়া যায়।

* * *

ভগবান্ ত্রিগুণাত্মকও বটেন; ত্রিগুণাতীতও বটেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে অনুস্যূত আছেন। এই বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক; সুতরাং এই দিক দিয়া তিনিও ত্রিগুণাত্মক। যাহা কিছু আছে বা হইবে, সমস্তই তিনি—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই বিশ্ব তাঁহারই প্রকাশ। সত্ত্ব-রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের সমবায়ে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যখন ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রলয় হয়। সমস্ত বিশ্ব ভগবানে লীন হয়—তিনি তখন আপনাতে আপনি বর্ত্তমান থাকেন; তখন তিনি বিশুদ্ধ সত্তা মাত্র হয়েন। * তাই মন্ত্রে তাঁহার ক্রিয়াশীল এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার এক পদ জগতে বর্ত্তমান থাকে; অর্থাৎ তিনি তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি ও তাঁহার মায়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে এক নহে। যে অংশ ত্রিগুণাতীত, মায়াতীত, তাহা তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্বা †; ত্রিগুণাত্মিকা যে মায়াশক্তি ‡, তাহাই জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে নিযুক্ত হয়।

* * *

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মানুষ সসীম, ভগবান্ অসীম। সুতরাং সসীম মানুষ তাহার সান্ত ভাব ও ভাষার দ্বারা সেই অসীম অনন্তকে প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষের সে শক্তি নাই। যখন মানুষ নিজে অনন্ত হয়, সীমার ঊর্দ্ধে গমন করে, তখনই সে সেই অসীম অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারে; কিন্তু তাহা জগতে প্রকাশ করিবার ভাষা তাহার নাই। সুতরাং অসম্পূর্ণ ভাষার দ্বারা তাঁহাকে আংশিক ভাবে প্রকাশ করা যায় মাত্র। মানুষের ভাব ও ভাষার এই দৈন্য মনে রাখিয়া আমাদিগকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 'তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা অংশ', 'ত্রিগুণাতীত অংশ' প্রভৃতি ভাষা আমরা ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু উহা আমাদিগের ভাষার দৈন্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি অখণ্ড অসীম। তাঁহার অংশ নাই, তাঁহাকে বিভক্ত করা যায় না। তাঁহার শক্তি প্রখ্যাপন করিবার জন্য আমাদিগকে শতদৈন্য সত্ত্বেও এই ভাষারই সাহায্য লইতে

---

* পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায়—"When the forces are at equillibrium."

† পাশ্চাত্য-মতে—"Pure Existence."

‡ পাশ্চাত্য-মতে—"Creative Energy.

হইবে। সুতরাং ভাষার শব্দার্থ ধরিয়া বিচার করিলে চলিবে না,—শব্দের পশ্চাতে যে বহুগুণে উচ্চ ভাব রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

* * *

এই উপলক্ষে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা টীপ্পনীতে মধ্যে মধ্যে ইংরেজী প্রতিশব্দ বা ইংরেজী অর্থ ব্যবহার করিতেছি। তাহার প্রধান কারণ এই যে, অনেকেই হিন্দু-দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য-দর্শনের মিলন করিতে অসমর্থ হয়েন; অথচ পাশ্চাত্য ভাব-প্রবাহের মধ্য দিয়াই তাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। লজ্জার বিষয় হইলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, এই শিক্ষা দীক্ষার সহিত প্রাচ্য ভাব-ধারার সংযোগ-সাধনের কোনও চেষ্টা দেখা যায় না। তাই পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ভারতবাসী, ভারতীয় সভ্যতা বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদিগের সুবিধার জন্যই ভারতীয় দর্শনে ব্যবহৃত শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ স্থানে স্থানে টীপ্পনীতে প্রকাশ করিয়াছি।

* *

এখন আবার মন্ত্রার্থ-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে 'তিনি চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুতে বর্ত্তমান আছেন।' এখানে 'চেতন অচেতন' বলায় বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অচেতন বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; কারণ, সমগ্র বিশ্বে সেই অনন্তচৈতন্যসত্তা বিদ্যমান আছেন। গাছে, পাথরে, ধূলিকণাতেও যে চৈতন্য বর্ত্তমান—সেই চৈতন্য অবিনাশী অক্ষয়। উহা শুধু ধর্ম্মতন্ত্রের মীমাংসা নয়। সেই প্রাচীন বেদজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান জগতের পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানানুমোদিত পন্থায় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানগম্য যন্ত্রপাতির সাহায্যেও এই মহাসত্য প্রমাণিত হইতেছে। সেই চৈতন্যসত্তা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বর্ত্তমান আছেন; তাই ভগবদ্বাক্যে উক্ত হইয়াছে—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতং জগৎ।"

—•—

জ্ঞান-বেদ।

——:•:*:•:——

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।

১ ২ ৩ ১ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

* • *

'পুরুষঃ' (ভগবান্) 'এব' (হি) 'যদ্ ভূতং' (উৎপন্নং, জগৎ) 'চ' (তথা) যদ্ 'ভাব্যং' (ভবিষ্যজ্জগৎ, অনুৎপন্নং, ভগবতি বর্ত্তমানং, কারণাবস্থায়াং লীনং ইত্যর্থঃ) 'ইদং সর্ব্বং' (সর্ব্বং বিশ্বং) ভবতি—ইতি শেষঃ ; 'সর্ব্বা' (সর্ব্বাণি) 'ভূতানি' (উৎপন্নানি, বস্তূনি) 'অস্য' (ভগবতঃ, তস্য) 'ত্রিপাৎ' (ত্রয়ঃ অংশাঃ, ত্রিগুণাত্মকঃ) 'পাদঃ' (অংশঃ) ভবতি ইতি শেষঃ ; তথা 'অস্য' (ভগবতঃ, তস্য) 'অমৃতং' (অমৃতস্বরূপং, ত্রিগুণাতীতঃ অংশঃ ইত্যর্থঃ) 'দিবি' (দ্যোতনাত্মকে স্বপ্রকাশে, স্বরূপে) তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। বিশ্বঃ ভগবতঃ আংশিকঃ প্রকাশঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ।

* • *

এইটী—পুরুষ-সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র। বিশ্বের সহিত বিশ্বনাথের সম্বন্ধের বিষয় ভাবান্তরে এই মন্ত্রে লক্ষ্য করুন।

* • *

বিশ্ব ভগবানেরই প্রকাশ। এই জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত আছে। জগতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্তই তাঁহা হইতে আসিয়াছে এবং যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাও সেই ভগবান্ হইতে আসিবে। কারণ, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না! প্রকাশমান্ জগৎ তো তাঁহারই প্রকাশ। তাহা ব্যতীত ভবিষ্যৎ জগৎও তাঁহাতে কারণাবস্থায় * বর্ত্তমান আছে। তিনি জগতের মূলকারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ তাঁহাতেই ছিল, এবং প্রলয়ের পরেও তাঁহাতেই থাকিবে! সেই আদি কারণ হইতে জগৎ 'কার্য্যরূপে' † প্রকাশিত হয়। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতে 'কার্য্যকারণাভেদ' ‡ এই দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতেও এই মতবাদ সাদরে গৃহীত হইয়াছে। চৈতন্যবাদী § দার্শনিকদিগের মতে বিশ্বের মধ্য দিয়া ভগবানই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। শুধু তাই নয়। তিনি কেবলমাত্র বিশ্বেই পর্য্যবসিত নহেন। বিশ্বাতিরিক্ত তাঁহার অমৃতময় সত্তা আছে। তিনি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। ক্রিয়াশীল হইলে ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তিপ্রভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন; আবার, প্রলয়কালে আত্মলীন হইয়া অবস্থিত থাকেন। দর্শনশাস্ত্রে ব্রহ্মের এই শেষোক্ত অবস্থাকে 'কুটস্থ লক্ষণ' বলা হইয়াছে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—তাঁহার মহিমার তুলনায় অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তাঁহার ইঙ্গিতে মহাপ্রলয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাই তাঁহার মহিমার শেষ নয়। তিনি অমৃতস্বরূপ,—তাঁহার সন্তানগণকেও তিনি অমৃতত্ব প্রদান করেন। তিনি জগৎ, তিনি জগদতীত, তিনি ত্রিগুণাত্মক, তিনি ত্রিগুণাতীত। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই মহিমাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

* * *

---

* পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায়—"In casual state."

† পাশ্চাত্য-মতে—"As effect."

‡ পাশ্চাত্য-মতে—"Nondifference of cause and effect."

§ চৈতন্যবাদী (Idealist); ইঁহাদের মত,—The Eternal Idea is realising itself in and through the universe.

জ্ঞান-বেদ।

—— • ——

১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২ ২

তাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়াꣳশ্চ পুরুষঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

উত অমৃতত্বস্য ঈশানো যৎ অন্নেন অতিরোহতি॥

• • •

'তাবান্' (ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানরূপেণ অবস্থিতানি জগৎসৃষ্টিরূপকর্ম্মাণি) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'মহিমা' (সামর্থ্যং—বিশেষং ইতি যাবৎ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'চ' (তু) 'পুরুষঃ' (ভগবান্) 'ততঃ' (অস্যাঃ মহিমায়াঃ) অপি 'জ্যায়ান্' (অতিশয়েন অধিকঃ, মহত্তরঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'উত' (অপিচ) 'যদ্' (যঃ) অন্নেন' (শক্ত্যা, স্বশক্ত্যা) 'অতিরোহতি' (অতিক্রামতি,—বিশ্বং ইতি যাবৎ) সঃ ভগবান্ এব 'অমৃতত্বস্য' (অমৃতস্য) 'ঈশানঃ' (অধীশ্বরঃ, প্রদাতা ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতপ্রাপকঃ ভগবান্ অসীম-শক্তিসম্পন্নঃ ভবতি; তস্য মহিমায়াঃ একাংশং এব বিশ্বরূপেণ প্রাদুর্ভবতি—ইতি ভাবঃ।

• • •

এই মন্ত্র—পুরুষ-সূক্তের চতুর্থ মন্ত্র। সেই পুরুষ—ভগবানই যে মুক্তিদাতা, এই মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে।

• • •

ভগবান্ অমৃতপ্রাপক—তিনি অমৃতের অধীশ্বর। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। সৃষ্টি—এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি—তাঁহারই খেলা; আবার এই ত্রিগুণের বেড়াজালের মধ্য হইতে মানুষকে বাহির করিয়া তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দেওয়াও তাঁহারই খেলা। মানুষ এই অমৃতের আশাতেই চাতকের মত তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে। এক-ফোঁটা অমৃতবর্ষণে মানুষের অনন্ত পিপাসা চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। তাঁহার এই মুক্তিদায়ক মূর্ত্তিই এই মন্ত্রে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে॥

—— • ——

জ্ঞান-বেদ।

—:*:*:*:—

১ ২ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ততো বিরাট্ অজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
৩২ ৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমিং অথঃ পুরঃ॥

* *

'ততঃ' (তস্মাৎ আদিপুরুষাৎ) 'বিরাট্' (পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ, ব্রহ্মাণ্ডদেহঃ) 'অজায়ত' (উৎপন্ন ভবতি); 'বিরাজঃ অধি' (বিরাড্দেহস্তোপরি ব্রহ্মাণ্ডদেহে) 'পুরুষঃ' (আত্মা) উৎপন্নঃ ভবতি ইতি যাবৎ। পরমাত্মা বিশ্বাত্মরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডদেহে প্রবিশতি ইত্যর্থঃ। 'সঃ জাতঃ' (সঃ বিরাট্পুরুষঃ) 'অত্যরিচ্যতে' (অতিরিক্তঃ ভবতি, দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিরূপঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); 'পশ্চাৎ' (ততঃ) 'ভূমিং' (পৃথিবীং) সৃজতি ইতি যাবৎ; 'অথঃ' (অনন্তরং) 'পুরঃ' (জীবানাং আশ্রয়স্থানং—দেহং) সৃজতি ইতি শেষঃ। অত্র মন্ত্রে সৃষ্টিক্রমঃ বিবৃতঃ, ভগবতঃ হি সর্ব্বং জগৎ উৎপন্নং—ইতি ভাবঃ॥

* * *

এই মন্ত্রটী—পুরুষসূক্তের পঞ্চম মন্ত্র। এই মন্ত্রে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা বর্ত্তমান কাল ব্যবহার করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, ভগবানের নিকট সমস্ত কালই নিত্য বর্ত্তমান। অনন্তের দিক দিয়া একমাত্র বর্ত্তমান ব্যতীত অন্য কাল নাই। *

---

* পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে—From the standpoint of Eternity—sub-specie eternitatis.

সৃষ্টি ও প্রলয় প্রতি মুহূর্ত্তেই সঙ্ঘটিত হইতেছে। সৃষ্টিক্রমও অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। তাই আমরা বর্ত্তমান কাল ব্যবহার করিয়াছি।

* * *

সেই পরমপুরুষ ভগবান্ আপনার মহিমায় অবস্থিত আছেন। তাঁহার ইচ্ছায় প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড—এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। এই বিশ্বের মধ্যে তাঁহার চৈতন্যশক্তি প্রবেশ করে। তাঁহা হইতে ক্রমশঃ দ্যুলোক ভূলোক স্থাবর জঙ্গম সমস্ত উৎপন্ন হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। এই বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতেও তাঁহার শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। *

* * *

---

* কি ভাবে তিনি বিশ্বে ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন, পুরুষসূক্তের অবশিষ্ট কয়েকটী মন্ত্রে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সে সকল মন্ত্রের বিশ্লেষণে সৃষ্টির ক্রম-বিষয়ে একটা ধারণা জন্মে। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অধুনা যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত আছে, তাহার মূল-তত্ত্ব এই পুরুষসূক্তে অবগত হইতে পারা যায়; এবং জগতে যে জাতি বর্ণ ও কর্ম্ম-বিভাগ প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। সেই সকল মন্ত্রের অর্থ উপলক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নরূপ বিচার-বিতণ্ডা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার আর একটী মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

এই মন্ত্র উপলক্ষে এক শ্রেণীর সামাজিকগণ প্রাচীনকালে যে জাতিভেদ-প্রথা বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান; অন্য শ্রেণীর সামাজিকগণ পরবর্ত্তিকালের প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র বলিয়া এই মন্ত্রটীকে পরিহার করিতে চাহেন।

অথর্ব্ববেদে এই সকল মন্ত্রই সামান্য পরিবর্ত্তিত-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য তিন বেদে 'সহস্রশীর্ষাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটী অপরিবর্ত্তিত ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু অথর্ব্ববেদে 'সহস্রশীর্ষাঃ' স্থলে 'সহস্রবাহুঃ' পাঠ দেখিতে পাই। আরও 'ত্রিপাদূর্দ্ধ' প্রভৃতি মন্ত্রটীর পরিবর্ত্তে অথর্ব্ববেদে 'ত্রিভিঃ পদ্ভির্দ্যামারোহৎ' ইত্যাদি পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। পাঠ বিভিন্ন হইলেও, মন্ত্রসমূহ যে অভিন্নভাবদ্যোতক এবং ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব-প্রখ্যাপক, তাহাতে কোনও সংশয় নাই।

জ্ঞান-বেদ।

——:+:*:+:——

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো

নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ।

যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম

মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ॥

'মহদ্ভ্যঃ' (প্রসিদ্ধেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি); 'অর্ভকেভ্যঃ' (অপ্রসিদ্ধেভ্যঃ, ক্ষুদ্রেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি); 'যুবভ্যঃ' (তরুণেভ্যঃ, নবপ্রসিদ্ধিসম্পন্নেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি); 'আশিনেভ্যঃ' (বৃদ্ধেভ্যঃ, পূর্ণগৌরবেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি); 'যদি শক্নবাম' (যদি সমর্থো ভবাম, যাবৎ অশক্ত ন ভূয়াম) 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টান্) 'যজাম' (যজামহে/ভজামহে); 'দেবাঃ' (হে দেবনিবহাঃ) 'জ্যায়সঃ' (জ্যেষ্ঠস্য, মদধিকগুণসম্পন্নস্য, পূজার্হস্য দেবস্য) 'শংসং' (স্তোত্রং, পূজাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'মা বৃক্ষি' (অহং বিচ্ছিন্নং মা কার্য্যং)। হে ভগবন্! সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূজায়াং মমানুরাগং অবিচলং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

* . *

হে সর্ব্বেশ্বর! হে সর্ব্বময়! তুমি তো সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান্! কোন্ দেবতায় তুমি নাই? সকল দেবতাই তো তোমার বিভূতি! তবে কেন বিভ্রম আসে? তবে কেন ভেদ-ভাবে দেখি? তবে কেন দেবতায়

ক্ষুদ্র বৃহৎ নীচ মহৎ গুণের ন্যূনাধিক্য কল্পনা করি ? 'অমুক দেবতা বড়', 'অমুক দেবতা ছোট', 'অমুক দেবতায় গুণের আধিক্য আছে', 'অমুক দেবতায় গুণের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতেছি', 'অমুক দেবতা বৃদ্ধ মাহাত্ম্যশূন্য হইয়াছেন', 'অমুক দেবতা নবীন জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছেন',—এ সকল চিন্তা কেন মনে আসে ? এ সকল অতি নীচ-কল্পনা-মূলক। যাঁহার সামান্যমাত্র জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে, যিনি সাধনার একটু উচ্চস্তরে পদার্পণ করিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই দেবতার মধ্যে ইতর-বিশেষ ক্ষুদ্র-মহৎ দেখিতে পান না ; তাঁহার দৃষ্টিতে দেবতা সকলই সমান,—সকলই অভিন্ন। তাই তিনি কোনও দেবতাকে ছোট ভাবিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন না, অথবা কোনও দেবতাকে অন্য দেবতা অপেক্ষা তুলনায় 'বড়' ভাবিয়া তাঁহার পূজার জন্য অধিকতর আয়োজনে প্রবৃত্ত হন না। দেবতার সম্বন্ধে কোনরূপ তর-তম-ভাব সাধকের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না। সকল দেবতার চরণেই তিনি সমান ভক্তিভরে প্রণত হন,—সকল দেবভাবকেই তিনি ধ্যান-ধারণার সামগ্রী বলিয়া মনে করেন।

* * *

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ যেন ঐ ভাবের ব্যত্যয় না হয়। জ্ঞান থাকিতে, সংজ্ঞা থাকিতে আমরা যেন কোনও দেবতাকে ভেদভাবে দর্শন না করি ! ধনী তুমি ; দেবারাধনায় ধনের সদ্ব্যবহার করিতে চাও ? সকল দেবতার প্রতি সমান দৃষ্টিতে পূজায় প্রবৃত্ত হও। তুমি শাক্ত—শক্তির উপাসক ; তোমার প্রতিবাসী শৈব—শিবের উপাসক। তাই, তোমাদের দুই জনের মধ্যে কি দ্বন্দ্বই না চলিয়াছে ! কিন্তু শিব-শক্তি কি ভিন্ন ? ভ্রান্ত ! কেন তোমার এ বিভ্রম আসে ? বৈষ্ণবের উপাস্য-দেবতা বিষ্ণুর প্রতিই বা কেন, হে শাক্ত, তোমার বিরাগ-ভাব দেখি ? আবার বৈষ্ণবই বা কেন, তোমার ইষ্টদেবতা কালীতারা-মহাবিদ্যার নাম-শ্রবণে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন ? হিন্দু মুসলমান-খৃষ্টান-পারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে এ সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব-বিতণ্ডার তো অবধিই নাই ! পরন্তু এক এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও কত দ্বন্দ্বই দেখিতে পাই। খৃষ্টানের রোমান্-ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে, মুসলমান-দিগের সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়-দ্বয়ের মধ্যে, কতকাল ধরিয়া কি শোণিত-

স্রাবী দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের অঙ্কে তাহা ভীষণ রক্ত-বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে—প্রত্যক্ষ করুন। শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব আজিও হিন্দুসমাজকে কলঙ্ক-কলুষিত করিয়া রাখে নাই কি? হিন্দুর সহিত বৌদ্ধদিগের, আবার বৌদ্ধগণের সহিত জৈনদিগের কি ভীষণ দ্বন্দ্বই চলিয়াছিল! ভ্রান্ত ভেদ-বুদ্ধিই সকল বিতণ্ডার মূলীভূত নহে কি? মন্ত্র বলিতেছেন,—ভগবান্ কহিতেছেন,—'ভেদ-বুদ্ধি পরিহার কর। যতক্ষণ জীবন আছে, যতক্ষণ সামর্থ্য পাও, সকল দেবতাকে—সকল দেবভাবকে—ভগবানের সর্ব্বপ্রকার বিভূতিকে—অভিন্নভাবে দর্শন কর,—এক ভাবিয়া পূজা করিতে অভ্যস্ত হও।'

* * *

মন্ত্রের শেষ উপদেশ,—তুমি সকল দেবতাকে সমান ভক্তিসহকারে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাও,—'হে দেবগণ! আমার মতিগতি-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেও। আমি যেন সকল দেবতাকে অভিন্ন-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে সমর্থ হই! আমার হৃদয়ে যেন সংসারের সকল দেবতার প্রতি সর্ব্বথা সমান অনুরাগ সঞ্জাত হয়। কোনও দেবতার পূজা-অর্চ্চনায় যেন আমার বিরক্তি না ঘটে,—বিরতি না আসে। কোনও দেবতার সহিত যেন আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়—সকল দেবতার সর্ব্বরূপ দেবভাবে আমার অন্তর যেন সদা পরিপূর্ণ থাকে। সর্ব্বদেবতায় সমদর্শন, সকল প্রকার দেবভাবের বিকাশ—যেন আমাকে প্রাপ্ত হয়; হে দেবগণ, তাহাই বিহিত করুন। বলা বাহুল্য, এই ভাবই সাধনার প্রকৃষ্ট ভাব,—এই অবস্থাই সাধকের পরম শ্রেয়ঃ অবস্থা। বিভিন্ন দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হইতে, উচ্চাবচ স্তরগত দেবতার আরাধনায় [illegible]চিত্ত হইতে হইতে, তর-তম প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া দেবগণের সন্ধান লইতে লইতে মানুষ শেষে এই অবস্থায়ই উপনীত হয়। অগ্রসর হইতে হইতে, ক্রমেই ভেদভাব দূরে চলিয়া যায়। শেষে তাঁহার আত্মবোধ হয়; জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেবদ্বারে প্রণত হইয়া প্রার্থনা জানাইবার অধিকার আসে,—

"নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ ॥"

* * *

ঋষিকুমার শুনঃশেপের যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই মন্ত্রের এবং ইহার পরবর্ত্তী কতকগুলি মন্ত্রের প্রবর্ত্তনার বিষয় ভাষ্যকারগণ খ্যাপন করিয়া আসিতেছেন; সে দিক্ দিয়া দেখিলেও এই মন্ত্রের একটী বিশেষ সার্থকতা উপলব্ধ হয়। বন্ধন-মোচনের জন্য, শুনঃশেপ, একে একে বহু দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে, পরিশেষে যখন স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধ হইল, তখন তাঁহার ভেদভাব দূরে গেল। প্রথমে তিনি দেবতাবিশেষকে প্রধান ও অপ্রধান ভাবিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; এখন তিনি সকলকেই এক বুঝিয়া প্রণতি জানাইলেন। এই ভাবই বন্ধন-মোচনের মূলীভূত। শুনঃশেপ কেন, সংসারে সকল সাধকেরই এই অবস্থা। বন্ধন-মোচন এইরূপেই সাধিত হয়। সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে এই শিক্ষাই সার শিক্ষা বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে ও আসিবে। বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদ যে নিত্য সত্য, বেদ যে আত্মজ্ঞান-সাধক,—এ মন্ত্র তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রের তাই মুখ্য প্রার্থনা —'হে দেবগণ! যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকিবে, যতক্ষণ আমার শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ যেন আমি সকল দেবতার প্রতিই সমভাবে অনুরক্ত হই। আমি দীনাতিদীন অতি হীন; সকলেই আমার অপেক্ষা গরিষ্ঠ; আমি যেন সকলকেই পূজা করিতে প্রবৃত্ত থাকি,—তাঁহাদের কাহারও সহিত আমার সম্বন্ধ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়।' দেবতার সকল সদ্ভাব যেন মানুষে সঞ্জাত হয়,—মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম।